আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ৩ ■ জুলাই ২০২৬ www.al-ummah.org

অভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কাছাকাছি

তুরস্ক-বাংলাদেশ

হাকান ফিদানের যুগান্তকারী সফর:

বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কৌশলগত দিগন্তের উন্মোচন

ব্যারেলের ওপারে : তেলের আড়ালে ঢাকা পড়া এক অন্ধকার ইতিহাস

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানাঃ info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

মাত্র ৩ মাসেই স্বতন্ত্র ছাপ 'আল-উম্মাহ'র

তিন মাস। একটি প্রকাশনার জীবদ্দশায় যা কেবল একটি পলকের চেয়ে বেশি কিছু নয়। তবুও, এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই 'আল-উম্মাহ' ম্যাগাজিনটি তার নিজস্ব ও স্বতন্ত্র একটি ছাপ তৈরি করতে পেরেছে। এটি আর কেবল কাগজের পাতার গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নেই, বরং আমাদের সম্মানিত পাঠকদের হৃদয়ে আলোড়ন তোলা এক প্রাণবন্ত ও বুদ্ধিবৃত্তিক সংলাপে পরিণত হয়েছে। এই বিপুল ও উষ্ণ সাড়া আমাদের সেই আদি লক্ষ্যকেই সত্য প্রমাণিত করে–তা হলো এমন এক বিদগ্ধ পাঠকসমাজের সাথে যুক্ত হওয়া, যারা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে মননশীল আলোচনার একটি উপযুক্ত মাধ্যমের জন্য ব্যাকুল ছিলেন।

এই তৃতীয় সংস্করণটি যখন আপনার হাতে পৌঁছাবে, তখন আমরা আরেকটি বড় মাইলফলক উদযাপন করতে যাচ্ছি। আমাদের এই বুদ্ধিবৃত্তিক মিশন ও আলোচনাকে পরবর্তী ধাপে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে আগামী ৪ জুলাই ঢাকায় 'আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন' একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকতে সদয় সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। এছাড়া তুরস্ক প্রজাতন্ত্র থেকে দেশটির ক্ষমতাসীন জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (একে) পার্টির সাবেক ডেপুটি চেয়ারম্যান ও প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরদোয়ানের প্রাক্তন উপদেষ্টা অধ্যাপক ইয়াসিন আকতাই বিশেষ অতিথি হিসেবে এই আয়োজনে উপস্থিত হচ্ছেন। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আ ফ ম খালিদ হোসেনসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ, প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, বরেণ্য সাংবাদিক এবং বিশ্বজুড়ে আগত একঝাঁক বিশিষ্ট চিন্তাবিদ আমাদের সাথে এই আয়োজনে যোগ দেবেন। এটি কেবল একটি বৈশ্বিক অনুষ্ঠানই নয়; এটি আমাদের সম্মিলিত পথচলা ও বিশ্বাসের এক অনন্য স্মারক।

অনুষ্ঠানে একটি বিশেষ প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। সেখানে প্রথিতযশা ব্যক্তিত্ববর্গ মুসলিম উম্মাহর নানাবিধ সমসাময়িক সংকট এবং এই ক্ষেত্রে 'আল-উম্মাহ'র মতো প্রকাশনাগুলো কীভাবে অর্থপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে–তা নিয়ে আলোকপাত করবেন। এই প্যানেলে থাকছেন:

- ইঞ্জিনিয়ার মুনির সাঈদ (ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল, ইসলামিক ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর থট অ্যান্ড সিভিলাইজেশন)
- ড. আয়মান জাইদান (এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, ইন্টারন্যাশনাল আল-কুদস ফাউন্ডেশন)
- ড. ফাতহি আব্দুল কাদির (ডিরেক্টর, আল-রওয়াদ একাডেমি, ইস্তাম্বুল)
- ড. নিয়াজ আহমেদ খান (সাবেক ভিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
- ড. মিয়া মোহাম্মদ আইয়ুব (সাবেক সচিব এবং সদস্য, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন)
- ড. মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ (মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট-বিআইআইটি)

সময় এসেছে আমরা সবাই মিলে এই প্রারম্ভিক পদক্ষেপটিকে একটি বিরাট সাফল্যে রূপান্তর করি, যা আমাদের সময়ের মেধা ও মননের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে।

জুলাই সংস্করণ: কী থাকছে এবারের মলাটে

আপনার হাতে কিংবা ডিজিটাল স্ক্রিনে থাকা এই সর্বশেষ সংস্করণটি আশা করি আবারও আপনার প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হবে। এবারের মলাটের ভেতরে আপনি এমন কিছু প্রতিবেদন ও নিবন্ধ পাবেন যা কেবল গুরুত্বপূর্ণই নয়, বরং বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের সাম্প্রতিক বাংলাদেশ সফর বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। আমাদের প্রধান প্রতিবেদনটি (কভার স্টোরি) এই ঐতিহাসিক সফরের সুদূরপ্রসারী কৌশলগত তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে বিভিন্ন সূত্র ও ঘটনাকে এক সুতোয় বেঁধেছে। পাশাপাশি, মধ্যপ্রাচ্যের চিরন্তন 'ভূ-রাজনৈতিক খেলা'র ওপর কড়া নজর রেখে তৈরি হয়েছে বিশেষ প্রতিবেদন 'বিয়ন্ড দ্য ব্যারেল'। তেলের ইতিহাস ও রাজনীতি খুঁড়ে এটি দেখিয়েছে–কীভাবে এই একটি প্রাকৃতিক সম্পদ বৈশ্বিক অর্থনীতি ও ক্ষমতাকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করে চলেছে।

আধুনিক প্রযুক্তি বৈশ্বিক পরিমণ্ডলের চিরচেনা রূপ বদলে দিচ্ছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) প্রায় প্রতিটি খাতকে আলোড়িত করার পর, এখন মানুষকে নতুন করে ভাবিয়ে তুলছে–এটি নিজের কোনো স্বাধীন সত্তা বা মনস্তত্ত্ব তৈরি করছে কি না। একটি বুদ্ধিদীপ্ত বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সংস্করণে আপনি তার উত্তর খোঁজার চেষ্টা পাবেন। এছাড়া ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সামঞ্জস্যতা নিয়ে যুগ পুরনো যে বিতর্ক, তার গভীর রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে রয়েছে একটি বিশেষ নিবন্ধ। এর পাশাপাশি সংকটের সময়েও মানুষের সৃজনশীলতার খোঁজ নিয়ে থাকছে আরেকটি ভিন্নধর্মী লেখা।

কাশ্মীর বিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কীভাবে আরব সমাজকে নতুন রূপ দিচ্ছে তার নির্মোহ বিশ্লেষণ এবং সম্প্রতি পরলোকগত একজন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা বিশেষ শোকগাথাসহ আরও বেশ কিছু উপাদানকে আমরা এই সংস্করণে স্থান দিয়েছি। আশা করি, পাঠক এটিকে তথ্যবহুল এবং গভীরভাবে ভাববার মতো একটি চমৎকার সংখ্যা হিসেবে গ্রহণ করবেন।

প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল

প্রধান সম্পাদক

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক

মাসুমুর রহমান খলিলী

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:

info@al-ummah.org

www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة

AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)

ঢাকা, বাংলাদেশ

মূল্য : ৫০ টাকা

বর্ষ ১ জুলাই ২০২৬ সংখ্যা ৩

অভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কাছাকাছি তুরস্ক-বাংলাদেশ পৃ. ৪

৪ অভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কাছাকাছি তুরস্ক-বাংলাদেশ

৮ হাকান ফিদানের যুগান্তকারী সফর: বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কৌশলগত দিগন্তের উন্মোচন

১২ মুসলিমবিশ্ব পিছিয়ে কেন?

১৫ ব্যারেলের ওপারে: তেলের আড়ালে ঢাকা পড়া এক অন্ধকার ইতিহাস

১৮ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেভাবে আরব সমাজকে নতুন রূপ দিচ্ছে

২৩ কাশ্মীরকে বিশ্বের নজরে রেখেছে ১৯৪৮ সালের সেই ম্যান্ডেট

২৬ এআই কি নিজস্ব চিন্তাশক্তি বা মনের অধিকারী হচ্ছে?

৩০ রোহিঙ্গা সংকটের জটিল ভূরাজনীতি

ব্যারেলের ওপারে: তেলের আড়ালে ঢাকা পড়া এক অন্ধকার ইতিহাস পৃ. ১৫

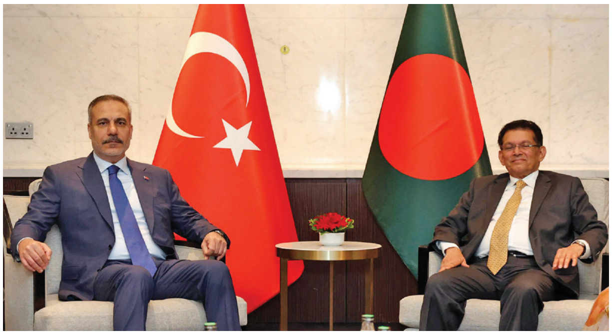

হাকান ফিদানের যুগান্তকারী সফর: বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কৌশলগত দিগন্তের উন্মোচন পৃ. ৮

৩৪ ড. মুহাম্মদ উমর চাপড়া : ইসলামী অর্থনীতির এক কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব

৩৮ বাদামি চামড়ার দায়বদ্ধতা: মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষ

৪০ ইসলাম ও গণতন্ত্র : সংঘাত, সামঞ্জস্য নাকি সংগতি?

৪৩ অন্ধকার যুগের আলো : বিশ্বকে বদলে দেওয়া মুসলিম পন্ডিতেরা

৪৭ মহামারি, যন্ত্রণা ও তুলির আঁচড় : সংকট যেভাবে জন্ম দেয় সৃজনশীলতার

৫১ নেতৃত্ব : সামাজিক পরিবর্তনের মূলমন্ত্র

৫৫ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় : মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিদর্শনের অনুসন্ধান

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেভাবে আরব সমাজকে নতুন রূপ দিচ্ছে পৃ. ১৮

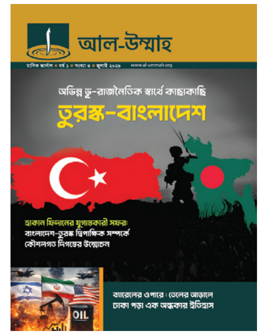

প্রতিবেদক

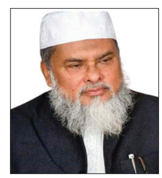
আ ফ ম খালিদ হোসেন, পিএইচডি

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

সৌদ এস. কাতেব পিএইচডি

ইমতিয়াজ খান পিএইচডি

তৌসিফ আহমদ পারাই পিএইচডি

আলফাজ আনাম

ডা. এম. বশীর আহমেদ, এম.ডি.

ওমর জাভেদ

লেখকদের প্রকাশিত মতামত তাদের নিজস্ব। প্রকাশক এর জন্য কোনো দায়ভার গ্রহণ করে না।

পাঠকেরা এই জার্নালের বিষয়বস্তু ব্যবহার, পুনর্মুদ্রণ বা পুনরায় প্রকাশ করতে পারবেন; তবে শর্ত থাকে যে এর জন্য আমাদের কাছ থেকে পূর্বানুমতি নিতে হবে এবং আমাদের ওয়েবসাইটের একটি লিঙ্ক যুক্ত করতে হবে।

এই জার্নালের বিষয়বস্তু বা এর ব্যবহার থেকে উদ্ভূত যেকোনো বিরোধের ক্ষেত্রে ঢাকার আদালতের একচেটিয়া এখতিয়ার থাকবে।

অভিন্ন ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে কাছাকাছি
তুরস্ক-বাংলাদেশ

এম. নাসির জাওয়েদ
সাবেক সম্পাদক 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড'
নয়া দিল্লি

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফর বাংলাদেশ ও তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন গতি সঞ্চার করেছে। উভয় দেশই এখন এই সম্পর্ককে একটি মজবুত, কৌশলগত এবং অর্থবহ অংশীদারিত্বে রূপ দিতে গভীরভাবে আগ্রহী।

দীর্ঘদিন ধরে—বিশেষ করে বিগত শেখ হাসিনা সরকারের আমলে—বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে এক ধরণের ভারত-কেন্দ্রিক প্রবণতা স্পষ্ট ছিল। তবে বর্তমান বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রচলিত বলয় এবং বিশেষ করে ভারত, চীন ও আমেরিকার ত্রিমুখী স্বার্থের গণ্ডি পেরিয়ে নতুন কৌশলগত দিগন্ত উন্মোচনের চেষ্টা চালাচ্ছে।

এই ভূ-রাজনৈতিক তৎপরতা আরও বেগবান হয়েছে সম্প্রতি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের ঢাকা সফরের মধ্য দিয়ে। এই সফর দুই দেশের প্রথাগত কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতাকে ছাপিয়ে এক গভীর কৌশলগত

বন্ধনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে—এই ঘনিষ্ঠতা আন্তর্জাতিক মহলে কেন এতটা মনোযোগ কাড়ছে এবং অনেক দেশেরই ভ্রু কুঁচকানোর কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে?

অভিন্ন সভ্যতার তাগিদ এবং সাংস্কৃতিক কূটনীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুই দেশই এখন আরও বড় ও নতুন ক্ষেত্রে কাজ করতে আগ্রহী। এই পারস্পরিক সদিচ্ছা তাদের কৌশলগত প্রয়োজনীয়তাকে এক দারুণ চালিকাশক্তি জোগাচ্ছে। এমন এক সময়ে যখন বৈশ্বিক জোটগুলো পুনর্গঠিত হচ্ছে, প্রযুক্তির প্রভাবে সম্পর্কের সংজ্ঞা পাল্টাচ্ছে এবং ভূ-রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি হচ্ছে—ঠিক তখনই তুরস্ক ও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেদের অবস্থান জোরালো করতে এক নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে।

সফরের মূল এজেন্ডা: বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা

৩ দিনের সফরে গত ৪ জুন ঢাকায় আসেন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদান। সফরকালে তিনি প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খলিলুর রহমান এবং বিরোধীদলীয় নেতা ড. শফিকুর রহমানসহ শীর্ষস্থানীয় নীতি-নির্ধারকদের সাথে বৈঠক করেন।

বৈঠকে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে ‘কৌশলগত’ পর্যায়ে উন্নীত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। এ সময় দুই দেশের মধ্যে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) স্বাক্ষরের বিষয়ে ইতিবাচক আলোচনা হয়।

উভয় দেশই দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বর্তমানের ১.৩ বিলিয়ন ডলার থেকে বাড়িয়ে ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার বড় লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। এর পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটিতে যৌথ উদ্যোগে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদন কারখানা গড়ে তোলার সম্ভাবনাসহ গভীরতর প্রতিরক্ষা-শিল্প সহযোগিতার বিষয়গুলোও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

অর্থনৈতিক ও সামরিক পরিপূরকতা

এই সফর দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সঠিক দিশায় এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে দুই দেশের বিশাল সম্ভাবনার বিষয়টি ফুটিয়ে তুলেছে। বাংলাদেশ কেবল তৈরি পোশাক শিল্পের জন্যই বিখ্যাত নয়; বরং চামড়াজাত পণ্য, ওষুধ, সিরামিক, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য এবং তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) খাতের এক উদীয়মান শক্তি।

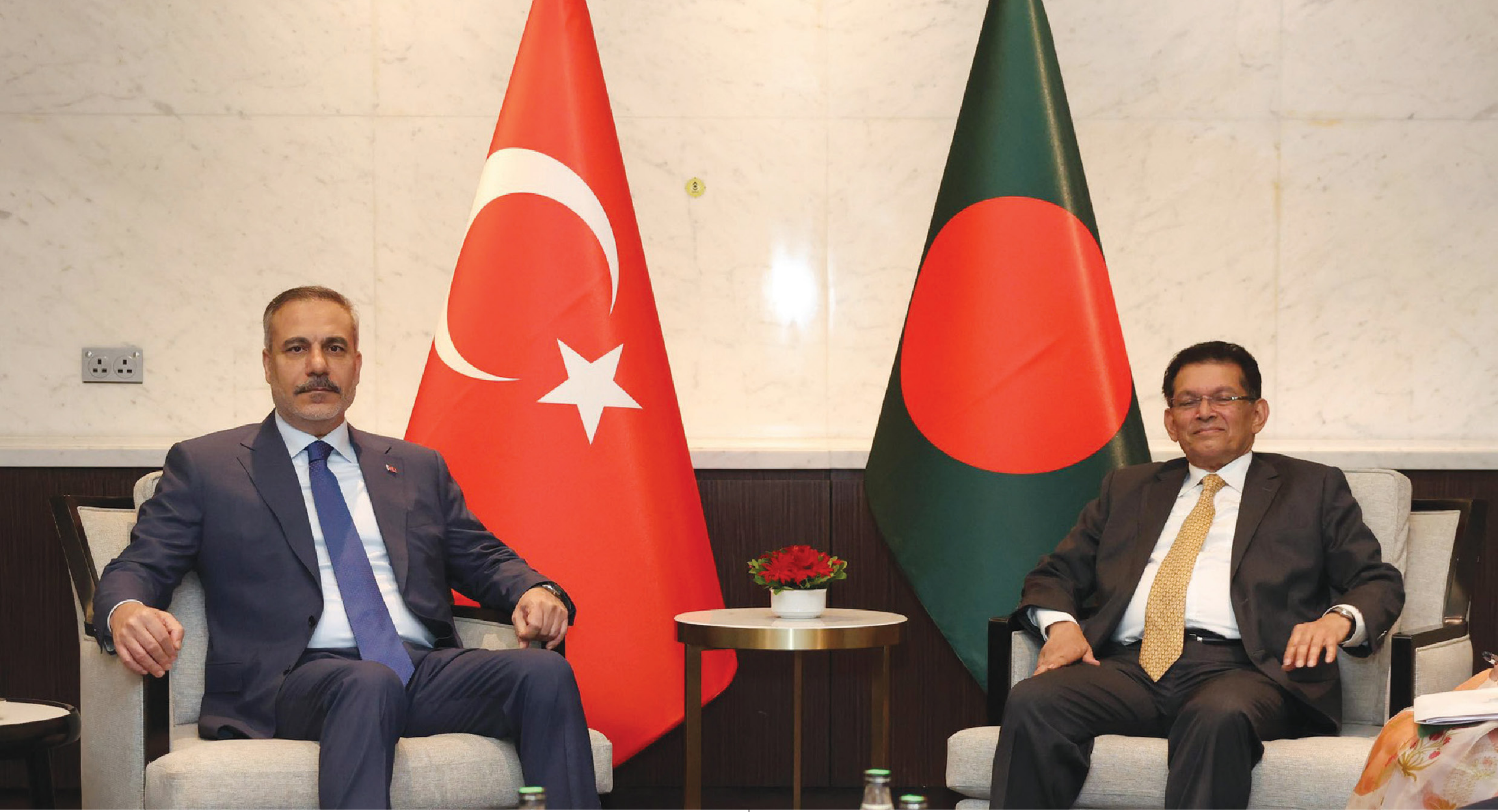

অন্যদিকে, তুরস্ক বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম দ্রুত বর্ধনশীল সামরিক সরঞ্জাম রপ্তানিকারক দেশ, যা বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়নে (ফোর্সেস গোল) বড় ভূমিকা রাখতে পারে। দেশটি সাশ্রয়ী মূল্যে উচ্চপ্রযুক্তির ড্রোন, নেভাল প্ল্যাটফর্ম (নৌযান), সাঁজোয়া যান, ইলেকট্রনিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যবস্থা এবং ক্ষেপণাস্ত্র প্রযুক্তি তৈরি করে থাকে।

প্রতিরক্ষার পাশাপাশি তুরস্কের শিল্প ও টেক্সটাইল যন্ত্রপাতি, বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, নির্মাণ সামগ্রী, রাসায়নিক এবং আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত লাভজনক হতে পারে। একই সাথে, দ্রুত নগরায়ণ হতে থাকা বাংলাদেশে পরিবহন অবকাঠামো, নগর পরিকল্পনা এবং জ্বালানি প্রকল্পের ক্ষেত্রে তুরস্কের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার এক বড় বাজার রয়েছে।

তুরস্কের 'নতুন এশিয়া' নীতি

দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর পর এটিই কোনো তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। তবে একে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই। এটি মূলত তুরস্কের সুদূরপ্রসারী 'নতুন এশিয়া' কৌশলের অংশ, যা সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এশিয়া এবং ভারত মহাসাগরজুড়ে আঙ্কারার প্রভাব ও যোগাযোগকে গভীরতর করেছে।

২০১৯ সালের আগস্টে তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই কৌশলগত উদ্যোগটি চালু করে। এর মূল লক্ষ্য হলো আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং দেশভিত্তিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার মাধ্যমে এশিয়ার দেশগুলোর সাথে একটি সামগ্রিক, টেকসই ও সুসংগত সম্পর্ক গড়ে তোলা।

- অর্থনৈতিক অংশীদারিত্ব: উচ্চ-মূল্য সংযোজিত ও উন্নত প্রযুক্তি খাত, পর্যটন, অর্থায়ন, অবকাঠামো, লজিস্টিকস এবং গ্রিন এনার্জি প্রকল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
- সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন: ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কযুক্ত এশীয় দেশগুলোর সাথে শিক্ষা, বিজ্ঞান, শিল্পকলা ও ক্রীড়া বিনিময়ের মাধ্যমে জনগণের মাঝে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানো।
- প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়: ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম কূটনৈতিক নেটওয়ার্কের অধিকারী তুরস্কের এই অঞ্চলে ৩০টি দূতাবাস এবং ২৬টি কনস্যুলেট জেনারেল রয়েছে। একই সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রধান অর্থনৈতিক জোট 'আসিয়ান' (ASEAN)-এর সাথেও প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক জোরদারে কাজ করছে আঙ্কারা।

ইতিহাসের পাতায় দ্বিপাক্ষিক বন্ধন

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের ভিত্তিটি ঐতিহাসিকভাবেই অত্যন্ত মজবুত। ১৯৭৪ সালে তুরস্ক বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে এরও আগে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তুরস্কের স্বাধীনতা যুদ্ধের (১৯১৯-১৯২২) সময় অবিভক্ত ব্রিটিশ ভারতের বাঙালি মুসলমানরা মনস্তাত্ত্বিক ও আর্থিকভাবে তুরস্কের পাশে দাঁড়িয়েছিল। পরবর্তীতে, ১৯৭০ ও ৮০-এর দশক জুড়ে সাইপ্রাস ইস্যুতে তুরস্কের দাবিগুলোকে নিঃশর্ত সমর্থন দেয় বাংলাদেশ। বিনিময়ে তুরস্কও বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর রাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ায় কারিগরি ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছিল।

এছাড়া রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই জাতিসংঘ, জি-২০, মিকটা (MIKTA) এবং ওআইসি-সহ প্রতিটি বহুপাক্ষিক মঞ্চে আঙ্কারা সব সময় বাংলাদেশের পাশে থেকেছে। ২০১৭ সালে তুরস্কের ফার্স্ট লেডি এমিনে এরদোগান এবং

তৎকালীন তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী মেভলুত চাভুসোগলু স্বশরীরে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন করেছিলেন। তুর্কি সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থা (TIKA) এবং আফাদ (AFAD) এখনও বাংলাদেশে মানবিক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

উভয় দেশই বিপুল জনসংখ্যার মুসলিম রাষ্ট্র এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির জোট ডি-৮ (D-8) এর সদস্য। এই অভিন্ন আত্মপরিচয় ও সদিচ্ছার কারণে বিগত সরকারের আমলের রাজনৈতিক টানাপোড়েনের সময়েও দুই দেশের সুসম্পর্ক অটুট ছিল।

'প্রভু নয়, বন্ধু'—স্বতন্ত্র পররাষ্ট্রনীতির উদয়

২০২৪ সালের আগস্টে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট পুরোপুরি বদলে যাওয়ার পর বাংলাদেশ তার প্রথাগত বলয়ের বাইরে অংশীদারিত্ব বহুমুখীকরণে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছে। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থার পর পরবর্তী নির্বাচিত সরকারও একটি স্বাধীন ও স্বায়ত্তশাসিত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণের স্পষ্ট আভাস দিয়ে রেখেছে।

সীমান্তের ওপারে 'প্রভু নয়, বন্ধু'—প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের এই বক্তব্যই মূলত বাংলাদেশের নতুন মনস্তত্ত্বকে ফুটিয়ে তোলে।

ঢাকা এখন এমন আন্তর্জাতিক অংশীদার চায় যারা সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক বজায় রাখবে। দক্ষিণ এশিয়ায় তুরস্কের কোনো ঔপনিবেশিক অতীত বা শোষণের ইতিহাস নেই; বরং ছোট দেশগুলোকে প্রকৃত অংশীদার হিসেবে সম্মান দেওয়ার এক দারুণ ঐতিহ্য রয়েছে তাদের। আর ঠিক এই কারণেই বাংলাদেশের এই নতুন ভাবনার সাথে তুরস্কের নামটা একদম নিখুঁতভাবে মিলে যায়।

কৌশলগত গুরুত্ব ও সমীকরণ

হাকান ফিদানের এই ঢাকা সফরকে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের আলোকেও দেখতে হবে। 'গ্লোবাল সাউথ' বা দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যে দক্ষিণ এশিয়া বর্তমানে একটি কেন্দ্রীয় কৌশলগত স্থান। তুরস্কের সাথে গড়ে ওঠা এই নতুন অংশীদারিত্ব নিশ্চিতভাবেই ঢাকাকে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ভূমিকা পালনের সুযোগ দিচ্ছে।

সুইজারল্যান্ড-ভিত্তিক কলামিস্ট শহিদুল আলম স্বপন 'সাউথ এশিয়ান হেরাল্ড'-এ যথার্থই লিখেছেন: "স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি মূলত একটি শক্তিশালী কৌশলগত ত্রিভুজের (ভারতের ভৌগোলিক আধিপত্য, চীনের অর্থনৈতিক উপস্থিতি এবং পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্য ও সুশাসনের শর্তাবলী) ভেতরে থেকেই আবর্তিত হয়েছে।" তুরস্কের অন্তর্ভুক্তি বাংলাদেশের এই কৌশলগত বৃত্তকে আরও প্রশস্ত করবে।

উপসংহার

তাই, হাকান ফিদানের এই সফরকে কেবল একটি প্রথাগত কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে দেখা ভুল হবে। এটি মূলত দুই দেশেরই সেই ক্রমবর্ধমান আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করে, যেখানে তারা কেবল সাংস্কৃতিক বা ঐতিহাসিক সম্পর্কের চেনা গণ্ডিতে আটকে না থেকে অংশীদারিত্বকে একটি সমসাময়িক কৌশলগত রূপ দিতে চায়। ঢাকার জন্য এটি সত্যিই এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত; কেবল দ্বিপাক্ষিক স্বার্থেই নয়, বরং দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে নিজের ভূমিকাকে আরও স্বাধীন ও প্রভাবশালী করে তোলার ক্ষেত্রেও এটি বাংলাদেশের একটি বড় পদক্ষেপ। ■

হাকান ফিদানের যুগান্তকারী সফর: বাংলাদেশ-তুরস্ক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কৌশলগত দিগন্তের উন্মোচন

আল-উম্মাহ রিপোর্ট

তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের তিন দিনের ঢাকা সফর বাংলাদেশ ও তুরস্কের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে এক নতুন ও সাহসী অধ্যায়ের সূচনা করেছে। এই সফর দুই দেশের সম্পর্ককে প্রথাগত কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতার গণ্ডি পেরিয়ে এক অনন্য কৌশলগত উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে। দীর্ঘ প্রায় ছয় বছর পর এটিই কোনো তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম বাংলাদেশ সফর। দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনশীল ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতার আলোকে দুই দেশের অংশীদারিত্বকে আরও সুদূরপ্রসারী করার এক দূরদর্শী প্রয়াস এই সফরের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়েছে।

বর্তমান আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় মধ্যম শক্তির দেশগুলোর (Middle Powers) মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতা দিন দিন আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একদিকে, বাংলাদেশ দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং সক্রিয় বৈশ্বিক কূটনীতির মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে নিজের অবস্থানকে দৃঢ় করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। অন্যদিকে, প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের নেতৃত্বে তুরস্ক ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও এশিয়াকে যুক্ত করে একটি স্বাধীন ও প্রভাবশালী বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। দুই দেশের এমন সমান্তরাল উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও সম্ভাবনার

প্রেক্ষাপটে, হাকান ফিদানের এই সফর পারস্পরিক স্বার্থ এবং বহুমাত্রিক সহযোগিতার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করল।

বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নতুন লক্ষ্য

বর্তমানে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ প্রায় ১.৩৫ বিলিয়ন ডলার। উভয় দেশই অদূর ভবিষ্যতে এই অঙ্ক ২ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত করার যৌথ লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে। তৈরি পোশাক, টেক্সটাইল, চামড়াজাত ও কৃষিজাত পণ্য দীর্ঘদিন ধরে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হলেও, এবারের উচ্চপর্যায়ের আলোচনায় উচ্চ-মূল্য সংযোজিত (high-value-added) শিল্প, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ শিল্প, অবকাঠামো উন্নয়ন এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানির ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ যেহেতু স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত প্রস্তুতি নিচ্ছে, তাই নতুন বাজার তৈরি, সরাসরি বিদেশী বিনিয়োগ (FDI) আকর্ষণ এবং প্রযুক্তিগত অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা এখন সময়ের দাবি। এই ক্ষেত্রে তুরস্কের উন্নত উৎপাদন শিল্প, আধুনিক প্রযুক্তি এবং বিশ্বমানের অবকাঠামো নির্মাণের অভিজ্ঞতা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক রূপান্তরে অত্যন্ত অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে পারে। এছাড়া, একটি সম্ভাব্য মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) বা অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA) নিয়ে চলমান আলোচনা সফল হলে তা দুই দেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটি স্থায়ী আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করবে, যা দক্ষিণ এশিয়া এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করতে পারবে।

প্রতিরক্ষা সহযোগিতা: সম্পর্কের চালিকাশক্তি

বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্কের সবচেয়ে গতিশীল এবং বহুল আলোচিত দিকটি হলো প্রতিরক্ষা সহযোগিতা। গত এক দশকে তুরস্ক বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ও দ্রুত বর্ধনশীল প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি উৎপাদক দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিশেষ করে ড্রোন প্রযুক্তি (যেমন–বায়রাক্তার টিবি২), আধুনিক সাঁজোয়া যান, নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ এবং উন্নত ইলেকট্রনিক যুদ্ধপ্রস্তুতি ব্যবস্থার ক্ষেত্রে তুরস্কের সাফল্য বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।

বাংলাদেশও তার সামরিক আধুনিকায়ন কর্মসূচি 'ফোর্সেস গোল'-এর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা সক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতাকে বিশেষ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে, দুই দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আর কেবল প্রচলিত অস্ত্র কেনার মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই; বরং তা যৌথ উৎপাদন, প্রযুক্তি হস্তান্তর (Transfer of Technology) এবং সামরিক বাহিনীর সদস্যদের উন্নত প্রশিক্ষণের মতো গভীর কৌশলগত সহযোগিতায় রূপ নিচ্ছে।

সামরিক বিশেষজ্ঞদের মতে, তুরস্ক বাংলাদেশের জন্য

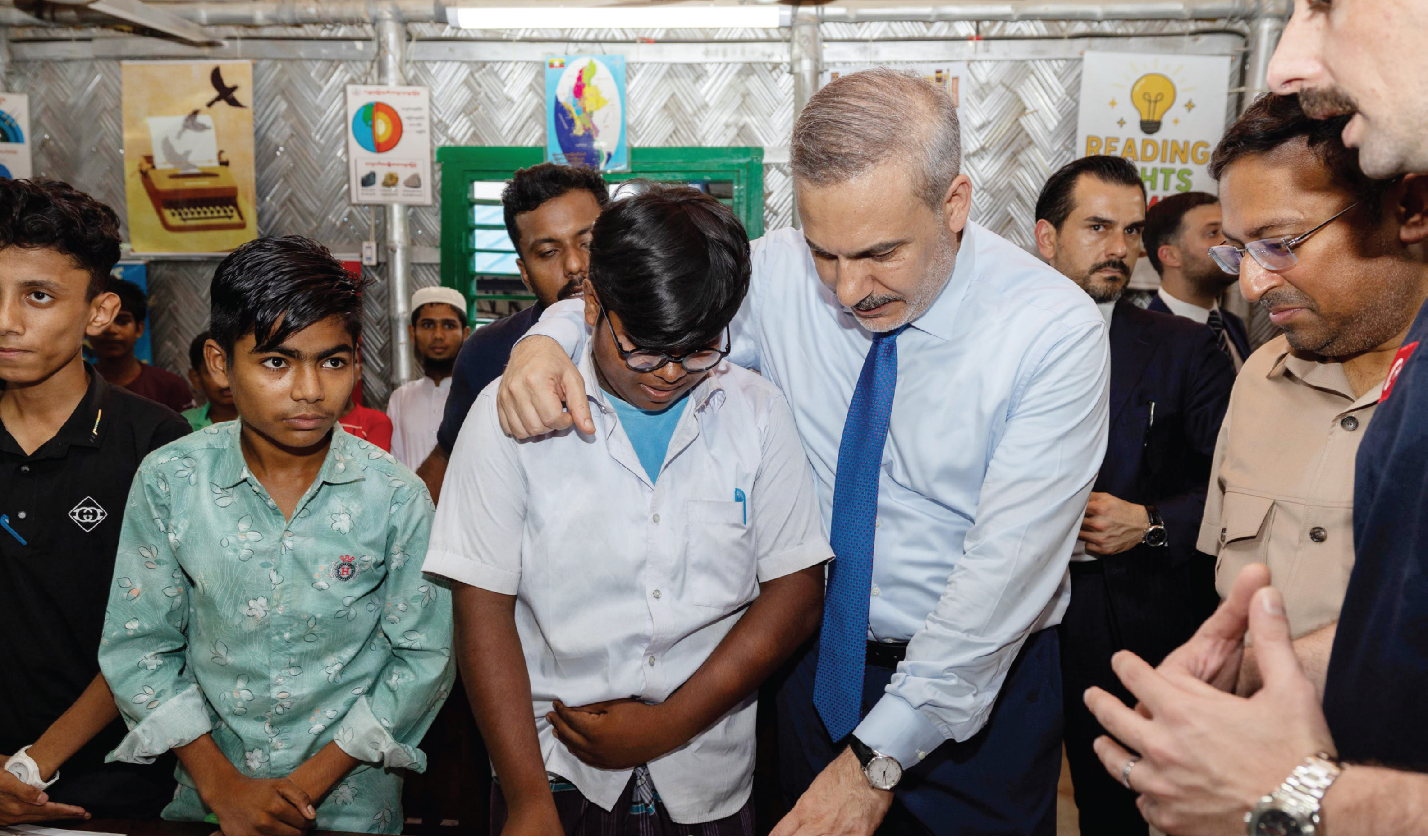

অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য এক অংশীদার। তুর্কি প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি কেবল সাশ্রয়ী এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরীক্ষিতই নয়, এটি সাধারণত পশ্চিমা সরবরাহকারীদের মতো কোনো জটিল ভূ-রাজনৈতিক শর্তের বেড়াজালে আটকে থাকে না। ফলে ঢাকা ও আঙ্কারার মধ্যকার প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আগামী দিনগুলোতে আরও বিস্তৃত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকট: মানবিক ও রাজনৈতিক যৌথ অবস্থান

হাকান ফিদানের এই সফরের অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ দিক ছিল কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী শিবির পরিদর্শন। শুরু থেকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে রোহিঙ্গা সংকটের পক্ষে সবচেয়ে সোচ্চার এবং সক্রিয় মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তুরস্ক অন্যতম। জাতিসংঘ এবং ওআইসি (ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা)-এর মতো বৈশ্বিক মঞ্চগুলোর মাধ্যমে আঙ্কারা ক্রমাগতভাবে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার রক্ষা এবং তাদের নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের পক্ষে জোর দাবি জানিয়ে আসছে।

বাংলাদেশ বর্তমানে ১০ লাখেরও বেশি বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিয়ে যাচ্ছে, যা দেশের অর্থনীতি, পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি করছে। এই পরিস্থিতিতে তুরস্কের মতো একটি প্রভাবশালী দেশের সরাসরি রাজনৈতিক ও মানবিক সমর্থন বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের কূটনৈতিক অবস্থানকে আরও শক্তিশালী করে। শরণার্থী শিবিরে তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই সফর কেবল আনুষ্ঠানিকতা ছিল না, বরং তা রোহিঙ্গা সংকটের প্রতি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মনোযোগ নতুন করে আকর্ষণের লক্ষ্যে একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক বার্তা বহন করে।

বহুপাক্ষিক কূটনীতি ও বৈশ্বিক সমন্বয়

বাংলাদেশ ও তুরস্ক–উভয় দেশই বহুপাক্ষিক কূটনীতি এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়। জাতিসংঘ, ওআইসি এবং ডি-৮ (উন্নয়নশীল আটটি দেশের অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থা)-এর মতো মঞ্চগুলোতে দুই দেশের সহযোগিতা এবং অভিন্ন নীতি দিন দিন আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

- অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি: টেকসই উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তন, শরণার্থী সংকট, খাদ্য নিরাপত্তা এবং গ্লোবাল সাউথ বা উন্নয়নশীল দেশগুলোর অধিকার রক্ষার মতো বিষয়ে দুই দেশের দৃষ্টিভঙ্গি একই রকম।
- মধ্যম শক্তির উত্থান: বর্তমানের চরম মেরুকরণের বিশ্বে, যেখানে পরাশক্তিগুলোর মধ্যকার প্রতিযোগিতা ক্রমাগত তীব্র হচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশ ও তুরস্কের মতো উদীয়মান মধ্যম শক্তির দেশগুলো নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় তাদের আওয়াজকে আরও জোরালো করতে চাইছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক ও ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণ

এই সফরের তাৎপর্য কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর একটি বৃহত্তর আঞ্চলিক ভূ-

রাজনৈতিক দিক রয়েছে। বাংলাদেশ বর্তমানে একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি মেনে চলছে, যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে গঠনমূলক সম্পর্ক বজায় রাখা সম্ভব হচ্ছে।

তুরস্কও একইভাবে একটি স্বাধীন ও বহুমাত্রিক কৌশলগত পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করে। আঙ্কারা একদিকে যেমন উত্তর আটলান্টিক চুক্তি সংস্থা (ন্যাটো)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, অন্যদিকে তেমনি মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া এবং দক্ষিণ এশিয়া জুড়ে তার কৌশলগত প্রভাব বাড়িয়ে চলেছে। এর ফলে, বাংলাদেশ-তুরস্ক অংশীদারিত্ব উভয় দেশকেই তাদের কূটনৈতিক যোগাযোগ আরও বহুমুখী করার একটি চমৎকার সুযোগ এনে দিচ্ছে। বঙ্গোপসাগর এবং সামগ্রিকভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্ব এই এলাকায় তুরস্কের অংশগ্রহণকে আরও বাড়াবে বলে আশা করা যায়, যা আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করবে।

ভবিষ্যতের পথরেখা

পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাকান ফিদানের এই ঢাকা সফর প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশ ও তুরস্কের সম্পর্ক এখন আর কেবল ঐতিহাসিক বন্ধুত্ব এবং সাংস্কৃতিক মিলের চেনা গণ্ডিতে আটকে নেই। দুই দেশ এখন অর্থনৈতিক সহযোগিতা, প্রতিরক্ষা, প্রযুক্তি এবং মানবিক কূটনীতিকে কেন্দ্র করে একটি সুনির্দিষ্ট 'কৌশলগত অংশীদারিত্ব' (Strategic Partnership) গড়ে তোলার দিকে ধাবিত হচ্ছে।

তবে এই সম্ভাবনাময় স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে কেবল কূটনৈতিক সদিচ্ছা বা যৌথ ঘোষণাই যথেষ্ট নয়। এর জন্য দ্রুত সুনির্দিষ্ট প্রকল্প হাতে নিতে হবে, বিনিয়োগের পরিবেশ আরও উন্নত করতে হবে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সুসংহত করতে হবে এবং বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো দক্ষতার সাথে বাস্তবায়ন করতে হবে। যদি এই কর্মপরিকল্পনা সফলভাবে সম্পন্ন করা যায়, তবে আগামী এক দশকে বাংলাদেশ-তুরস্ক সম্পর্ক দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে অন্যতম প্রভাবশালী এবং অনুকরণীয় কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত হতে পারে। ■

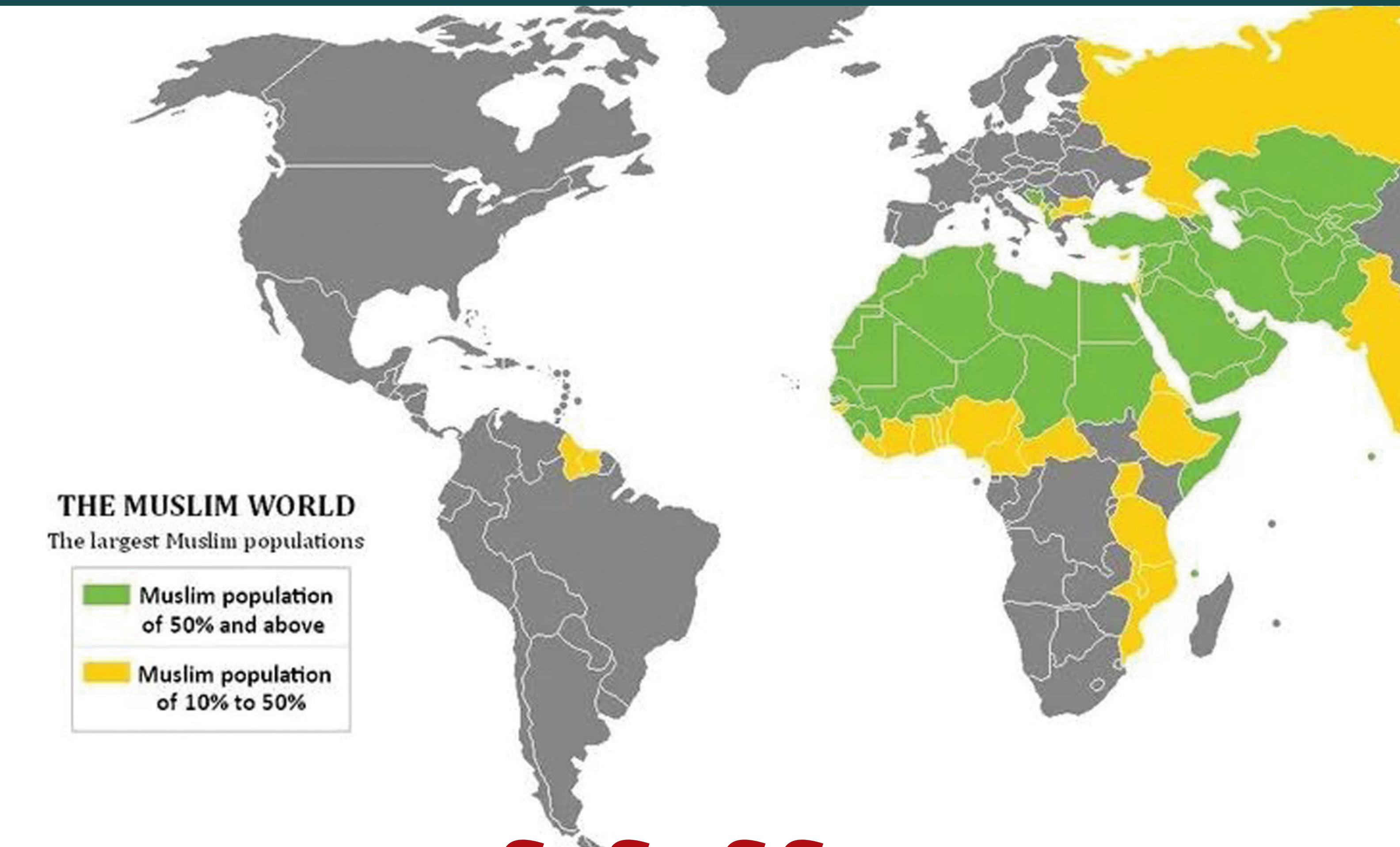

মুসলিমবিশ্ব পিছিয়ে কেন?

আ ফ ম খালিদ হোসেন পিএইচডি
সাবেক উপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়, অন্তর্বর্তী সরকার
drkhalid09@gmail.com

বিশ্বে প্রায় ৫৭টি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ-যাদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি আফ্রিকা থেকে এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য থেকে ইউরোপের প্রান্ত পর্যন্ত। জনসংখ্যা প্রায় ১.৯ বিলিয়ন, যা বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ। প্রাকৃতিক সম্পদ-বিশেষ করে তেল ও গ্যাস-বিশ্ব অর্থনীতির এক বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করে মুসলিম দেশগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের জ্বালানি, আফ্রিকার খনিজ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মানবসম্পদ- সব মিলিয়ে মুসলিম বিশ্ব এক বিরাট সম্ভাবনার আধার। তাহলে প্রশ্ন জাগে, এত জনশক্তি, সম্পদ ও ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও কেন আজকের বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও সাহিত্য সৃষ্টিতে মুসলিম বিশ্বের অবস্থান তুলনামূলকভাবে দুর্বল?

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, একসময় মুসলিম বিশ্বই ছিল জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। আব্বাসীয় যুগে বাগদাদে প্রতিষ্ঠিত House of Wisdom (বায়তুল হিকমাহ) ছিল বিশ্বের প্রথম সারির গবেষণা ও অনুবাদ কেন্দ্র। খলিফা আল মামুনের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে গ্রিক, পারস্য ও ভারতীয় জ্ঞানভাণ্ডার অনুবাদ ও উন্নয়ন করা হয়। এই জ্ঞানভিত্তিক আন্দোলন থেকে উঠে আসেন অসংখ্য মনীষী- ইবনে সিনা, চিকিৎসাবিজ্ঞানে যার Canon of Medicine শতাব্দীর পর শতাব্দী ইউরোপে পাঠ্য ছিল। আল খাওয়ারিজমি যার হাত ধরে বীজগণিত (Algebra) একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রে পরিণত হয়। আল ফারাবির, দর্শন ও রাজনৈতিক চিন্তায় যিনি গভীর প্রভাব ফেলেন। এই জ্ঞানধারা পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আজকের মুসলিম বিশ্বের চিত্র আশানুরূপ নয়। কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান বিষয়টি স্পষ্ট করে। গবেষণা ও উন্নয়নে মুসলিম দেশগুলোর গড় ব্যয় জিডিপির ০.৫ শতাংশেরও কম, যেখানে উন্নত দেশগুলোতে ২ থেকে ৪ শতাংশ বা

তার বেশি। বিশ্বের শীর্ষ ১০০ বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় মুসলিম দেশগুলোর উপস্থিতি খুবই সীমিত। বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্র প্রকাশনায় মুসলিম দেশগুলোর অবদান প্রায় ৮-১০ শতাংশ, যা তার জনসংখ্যার তুলনায় অনেক কম। সম্পদের প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও জ্ঞান-গবেষণা ও উৎপাদনে পিছিয়ে পড়া একটি বাস্তবতা। এই পশ্চাৎপদতার কারণ একক নয়; বরং তা জটিল ও বহুমাত্রিক। অনেক দেশে এখনো মুখস্থনির্ভর শিক্ষা প্রচলিত, যেখানে সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণধর্মী চিন্তা ও গবেষণার সুযোগ কম। ফলে শিক্ষিত জনশক্তি তৈরি হলেও তারা উদ্ভাবক হয়ে উঠতে পারে না। প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে বিপুল আয় সত্ত্বেও দীর্ঘমেয়াদি জ্ঞানভিত্তিক অর্থনীতিতে বিনিয়োগ কম।

তেলনির্ভর অর্থনীতি গবেষণা-উদ্ভাবনের বিকল্প হতে পারে না। মধ্যপ্রাচ্য ও অন্যান্য অঞ্চলে যুদ্ধ, সংঘাত ও ক্ষমতার দ্বন্দ্ব জ্ঞানচর্চার পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। স্থিতিশীলতা ছাড়া গবেষণা ও শিক্ষা বিকশিত হয়না। প্রতিভাবান শিক্ষার্থী ও গবেষকরা উন্নত সুযোগের খোঁজে পশ্চিমা বিশ্বে চলে যাচ্ছে এবং সেখানেই স্থায়ী হচ্ছে। ফলে নিজস্ব জ্ঞানভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়ছে। অনেক দেশে মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা ও গবেষণার ওপর নিয়ন্ত্রণ থাকায় নতুন চিন্তা ও উদ্ভাবন বাধাগ্রস্ত হয়। অনেক রাষ্ট্রে সামরিক বা অবকাঠামোগত উন্নয়নে জোর দেয়া হলেও জ্ঞান-বিজ্ঞান খাত তুলনামূলকভাবে উপেক্ষিত থাকে।

তাহলে অভাবটা কোথায়? মূল সমস্যা হলো- দীর্ঘমেয়াদি দৃষ্টিভঙ্গির অভাব, কার্যকর নীতির অভাব, জ্ঞানকেন্দ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার অভাব। উদ্যম থাকলেও তা সঠিক কাঠামো ও পরিবেশের অভাবে বাস্তব রূপ পায় না। মুসলিম বিশ্ব যদি আবার জ্ঞান-বিজ্ঞানের নেতৃত্বে ফিরতে চায়, তবে কিছু মৌলিক পরিবর্তন জরুরি। শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার, মুখস্থভিত্তিক শিক্ষা থেকে বেরিয়ে বিশ্লেষণ, গবেষণা ও উদ্ভাবনমুখী শিক্ষা চালু করতে হবে। গবেষণায় বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। জিডিপির কমপক্ষে ২ শতাংশ গবেষণা খাতে বিনিয়োগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। আধুনিক জ্ঞানকেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে। নতুন যুগের ঐড়ঁংব ড়ভ ডরংফড়স প্রতিষ্ঠা- যেখানে বিশ্বমানের গবেষণা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা হবে। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহযোগিতা জোরদার করার লক্ষ্যে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে যৌথ বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রকল্প ও প্রযুক্তি বিনিময় বাড়াতে হবে। মেধা ধরে রাখা ও আকর্ষণ করার জন্য গবেষকদের জন্য উন্নত সুযোগ-সুবিধা ও স্বাধীনতা নিশ্চিত করে নৎধরহ মধরহ তৈরি করতে হবে। জ্ঞানচর্চার জন্য মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও সমালোচনামূলক চিন্তার চর্চা অপরিহার্য।

মুসলিম বিশ্ব একসময় ছিল জ্ঞানের আলোকবর্তিকা, আজও সেই সম্ভাবনা নিঃশেষ হয়নি। সম্পদ, জনশক্তি ও ঐতিহ্য- সবই বিদ্যমান। প্রয়োজন কেবল সঠিক দিকনির্দেশনা, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা। যদি আব্বাসীয় যুগের মতো আবার জ্ঞানকে কেন্দ্র করে সভ্যতা গড়ে তোলা যায়, তবে মুসলিম বিশ্ব পুনরায় বৈশ্বিক জ্ঞান-সভ্যতার নেতৃত্বে ফিরে আসতে পারে। প্রশ্নটি তাই আর সম্ভাবনার নয়- প্রশ্ন হলো, আমরা কি সেই পথ বেছে নিতে প্রস্তুত? প্রশ্নটি সরল মনে হলেও এর ভেতরে রয়েছে ইতিহাস, নেতৃত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর একটি গভীর বাস্তবতা। সংক্ষেপে বললে কেবল আল-মামুন, তৃতীয় আবদুর রহমান বা হাকামের মতো ব্যক্তির অভাবই মূল সমস্যা নয়; বরং সেই ধরনের নেতৃত্বকে ধারণ ও টিকিয়ে রাখার পরিবেশের অভাবই বড় সংকট।

আব্বাসীয় খলিফা আল মামুন শুধু একজন শাসক ছিলেন না; তিনি ছিলেন জ্ঞানপিপাসু রাষ্ট্রনায়ক। তার পৃষ্ঠপোষকতায় বিশ্বমানের গবেষণা কেন্দ্র গড়ে উঠে। অন্যদিকে স্পেনে তৃতীয় আবদুর রহমান একটি শক্তিশালী, স্থিতিশীল ও সমৃদ্ধ রাষ্ট্র গড়ে তোলেন, যা ইউরোপের মধ্যে জ্ঞান ও সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তার উত্তরসূরি দ্বিতীয় আল হাকাম ছিলেন বইপ্রেমী শাসক-কথিত আছে, তার ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে লক্ষাধিক বই ছিল। এই তিনজনের মধ্যে একটি মিল স্পষ্ট: তারা জ্ঞানকে ক্ষমতার অলঙ্কার নয়, রাষ্ট্রের ভিত্তি হিসেবে দেখেছিলেন। তাহলে আজ কেন এমন নেতৃত্ব বিরল? আজকের বিশ্বে প্রতিভাবান, দূরদর্শী মানুষ নেই- এ কথা সত্য নয়। মুসলিম বিশ্বে এখনো অসংখ্য মেধাবী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ ও নীতিনির্ধারক রয়েছেন। কিন্তু সমস্যা হলো- তাদের বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতা, স্থিতিশীলতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সমর্থন অনেক

ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। আল-মামুন বা আবদুর রহমানের সময় রাষ্ট্রের মর্যাদা নির্ধারিত হতো জ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার উৎকর্ষ দিয়ে। আজ অনেক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অগ্রাধিকার চলে গেছে- ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা, নিরাপত্তা ও ভূরাজনীতি এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির বাহ্যিক সূচকে। ফলে জ্ঞানচর্চা মূল অ্যাজেন্ডা থেকে সরে গেছে। ঐতিহাসিক সেই শাসকরা শতাব্দীকে সামনে রেখে পরিকল্পনা করতেন। আজকের অনেক নেতৃত্ব স্বল্পমেয়াদি রাজনৈতিক লাভে বেশি মনোযোগী- যেখানে গবেষণা, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিনিয়োগের ফল তাৎক্ষণিকভাবে দৃশ্যমান হয় না।

ইতিহাসে দেখা যায়, আল-মামুন বিভিন্ন ধর্ম ও মতের পণ্ডিতদের একত্র করেছিলেন। আজ অনেক জায়গায় মতপ্রকাশের সীমাবদ্ধতা জ্ঞানচর্চাকে সঙ্কুচিত করে ফেলছে। তাহলে কি মুসলিম বিশ্বে আজ আল-মামুন বা আবদুর রহমানের মতো মানুষ নেই? বাস্তবতা হলো- মানুষের অভাব নয়, সেই মানুষদের উঠে আসার পরিবেশের অভাব।

ইতিহাস আমাদের শেখায়- একজন আল-মামুন একটি যুগের সূচনা করতে পারেন; কিন্তু সেই যুগকে টিকিয়ে রাখে একটি শক্তিশালী ব্যবস্থা। আজ মুসলিম বিশ্বের সামনে চ্যালেঞ্জটি তাই দ্বিমুখী; নতুন আলোকিত নেতৃত্ব সৃষ্টি করা এবং সেই নেতৃত্বকে টিকিয়ে রাখার জন্য জ্ঞানভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রশ্ন থাকতে পারে- মুসলিম বিশ্বের সামগ্রিক চিত্রে যখন জ্ঞান-বিজ্ঞান, গবেষণা ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতার ক্ষেত্রে এক ধরনের স্থবিরতা লক্ষ করা যায়, তখন একই পরিসরে সেখানে তুরস্ক ও ইরান কীভাবে তুলনামূলকভাবে এগিয়ে যেতে পারল? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে আমাদের ইতিহাস, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষা কাঠামো এবং আত্মনির্ভরতার মানসিকতা- সবকিছু একসাথে বিশ্লেষণ করতে হবে। তুরস্ক ও ইরান- উভয় দেশেরই রয়েছে দীর্ঘ সভ্যতার ঐতিহ্য এবং শক্তিশালী সাংস্কৃতিক আত্মপরিচয়। ইরান প্রাচীন পারস্য সভ্যতার উত্তরাধিকার বহন করে, যেখানে জ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য চর্চার ঐতিহ্য হাজার বছরের। অন্যদিকে তুরস্ক অটোমান সাম্রাজ্যের উত্তরসূরি হিসেবে একটি সুগঠিত প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো পেয়েছে। এই ঐতিহ্য তাদের রাষ্ট্রচিন্তায় একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলেছে। নিজস্ব সক্ষমতা ও জ্ঞানচর্চাকে জাতীয় শক্তির অংশ হিসেবে দেখেছে। দুটি দেশই তুলনামূলকভাবে উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় ধারাবাহিক বিনিয়োগ করেছে।

তুরস্কে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোকে আধুনিকায়ন করা হয়েছে। ইরান, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যেও, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। আজ ইরান মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শীর্ষ গবেষণা-প্রকাশনা উৎপাদক দেশগুলোর একটি। বিশেষ করে প্রকৌশল, চিকিৎসা ও ন্যানো-টেকনোলজিতে তাদের দৃশ্যমান অগ্রগতি রয়েছে। ইরানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো- নিষেধাজ্ঞা তাদেরকে বাধ্য করেছে আত্মনির্ভর হতে। পশ্চিমা প্রযুক্তির ওপর নির্ভরতা কমাতে গিয়ে তারা নিজস্ব গবেষণা ও উদ্ভাবনে জোর দিয়েছে। অন্যদিকে তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্প, ড্রোন প্রযুক্তি, অটোমোবাইল ও অবকাঠামো উন্নয়নে নিজস্ব সক্ষমতা গড়ে তুলেছে। তাদের ড্রোন প্রযুক্তি আজ বৈশ্বিকভাবে আলোচিত। এই দুই দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষণীয় যে- তাদের নীতির ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে। সরকার পরিবর্তন হলেও শিক্ষা, প্রযুক্তি ও শিল্প উন্নয়নের মৌলিক কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে পড়ে না। গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিল্প খাতের মধ্যে একটি কার্যকর সংযোগ রয়েছে। তুরস্ক ও ইরান উভয় দেশেই নিজস্ব ভাষায় সাহিত্য ও জ্ঞানচর্চার একটি শক্তিশালী ধারা বজায় রয়েছে। এতে জ্ঞানচর্চা শুধু এলিট শ্রেণিতে সীমাবদ্ধ থাকে না; বরং সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে যায়।

তুরস্ক ও ইরান উভয় দেশই গবেষণাকে শিল্পের সাথে যুক্ত করতে পেরেছে। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গবেষণা বের হয়ে শিল্প খাতে প্রয়োগ হচ্ছে। স্টার্টআপ, প্রতিরক্ষা শিল্প ও প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো গবেষণার ফল ব্যবহার করছে। এই সংযোগই তাদের অগ্রগতিকে বাস্তব রূপ দিয়েছে। তবে এটিও সত্য যে, এই দুই দেশ এখনো পশ্চিমা বিশ্বের সমতুল্য নয়। তাদের সামনে রয়েছে অর্থনৈতিক চাপ, রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের জটিলতা। তবুও তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিতে সক্ষম হয়েছে- সীমাবদ্ধতার মধ্যেও পরিকল্পনা, বিনিয়োগ ও আত্মনির্ভরতার মাধ্যমে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব।

অন্য মুসলিম দেশগুলো কেন পারছে না? তুলনামূলকভাবে অনেক মুসলিম দেশে দেখা যায়- তেলনির্ভর অর্থনীতি, যেখানে জ্ঞানভিত্তিক বিনিয়োগ কম, শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব। ফলে সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তা জ্ঞান ও প্রযুক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে না। মুসলিম বিশ্বের পতনের সূচনা কোনো একক কারণে হয়নি। রাজনৈতিক ভাঙন, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বহিরাগত আক্রমণ এবং বৈশ্বিক শক্তির পরিবর্তন- সব মিলিয়ে একটি দীর্ঘস্থায়ী স্থবিরতা তৈরি হয়। যে ধারায় জ্ঞানচর্চা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে প্রবাহিত হচ্ছিল, তা একসময় থমকে দাঁড়ায়। অন্যদিকে ইউরোপে রেনেসাঁ, বৈজ্ঞানিক বিপ্লব ও শিল্পবিপ্লবের মাধ্যমে নতুন এক জ্ঞানসভ্যতার উত্থান ঘটে। ফলে বৈশ্বিক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে স্থানান্তরিত হয়।

মুসলিম বিশ্বের পিছিয়ে পড়া কোনো স্থায়ী নিয়তি নয়; এটি একটি সময়িক বাস্তবতা। পিছিয়ে পড়ার কারণ একদিনে তৈরি হয়নি- উত্তরণও একদিনে হবে না। কিন্তু পথ পরিষ্কার; জ্ঞানকে রাষ্ট্রের কেন্দ্রবিন্দুতে আনা, সঠিক পরিকল্পনা, বিনিয়োগ বাড়ানো, স্বাধীন-সৃজনশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা এবং দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে এই পরিস্থিতি বদলানো সম্ভব। ইতিহাস আমাদের সামনে একটি স্পষ্ট বার্তা রেখে গেছে- যে জাতি জ্ঞানকে গুরুত্ব দেয়, সেই জাতিই সভ্যতার নেতৃত্ব দেয়। আজ মুসলিম বিশ্বের সামনে তাই এক নতুন আহ্বান- আবার জ্ঞানের পথে ফিরে আসা, আবার নেতৃত্বের স্বপ্ন দেখা। 'পিছিয়ে থাকা' স্থায়ী পরিচয় নয়; বরং এটি হবে একটি অস্থায়ী অধ্যায়, যার পরেই শুরু হতে পারে নতুন উত্থানের গল্প। ■

ব্যারেলের ওপারে:

তেলের আড়ালে ঢাকা পড়া এক অন্ধকার ইতিহাস

সুরূর আহমেদ
সিনিয়র সাংবাদিক, পাটনা, ভারত

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমের কল্যাণে আজ এমন এক সাধারণ ধারণা তৈরি হয়েছে যে, পশ্চিম এশিয়ার (মধ্যপ্রাচ্য) সংকটটি কেবলই জ্বালানির নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার এক লড়াই, অন্য কিছু নয়। অথচ বাস্তবতা হলো–এই অঞ্চলের শত বছরের পুরোনো দ্বন্দ্বের নেপথ্যে গভীর ধর্মীয়, আদর্শিক এবং সভ্যতার সংঘাত লুকিয়ে রয়েছে। যদি কেবল তেলের জন্যই ইরানের ওপর চড়াও হওয়া হতো, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেন পাশের দেশ কিউবার ওপর দিন দিন অবরোধের ফাঁস আরও শক্ত করছে? অথচ কিউবা নিজের টিকে থাকার জন্যই আমদানিকৃত তেলের ওপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। এর কারণ খুবই সহজ:এই দুটি দেশই ওয়াশিংটনের চাপের কাছে মাথা নত করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। দুটি দেশই যথাক্রমে

১৯৫৯ এবং ১৯৭৯ সালে বিপ্লবের মুখোমুখি হয়েছিল এবং মার্কিনপন্থী সরকারের পতন ঘটিয়েছিল।

এই প্রসঙ্গে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সেই হুমকির কথা মনে করিয়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই পড়ে না, যেখানে তিনি গত ৭ এপ্রিল বলেছিলেন, "আজ রাতে একটি আস্ত সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যাবে।" এটি অবশ্য ভিন্ন কথা যে, মাত্র কয়েক ঘণ্টা পরেই তিনি নিজের অবস্থান থেকে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যান এবং ইরানের সাথে একটি অস্বস্তিকর যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হতে বাধ্য হন।

পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের একটি নিরপেক্ষ অধ্যয়ন পুরো দৃশ্যপটটিকে সঠিকভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এখানে মূল কারণকে বাদ দিয়ে তার ফলাফলকে সামনে আনা এবং কোনো ভুল সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মোটেও ঠিক হবে না। জ্বালানি, ইউরেনিয়াম কিংবা হরমুজ প্রণালীর অবরোধ–এগুলো মূলত আসল সমস্যার উপজাত বা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মাত্র, যার মূল উৎস আসলে অনেক গভীরে প্রোথিত।

আধুনিক পদ্ধতিতে তেল অনুসন্ধান

প্রকৃত সত্য হলো, আধুনিক বিশ্বে তেলের প্রথম সফল অনুসন্ধান বা ড্রিলিং শুরু হয়েছিল ১৮৫৯ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থাৎ,১৮৩০-এর দশকে ব্রিটেনের প্রোটেস্ট্যান্ট-শাসিত শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক প্রথম ইহুদি জন্মভূমি প্রতিষ্ঠার ধারণাটি গ্রহণ করার প্রায় দুই দশক পর। মূলত, ১৮৮৫-৮৬ সালে মোটরগাড়ি আবিষ্কারের পর, বিশেষ করে ১৮৮০-এর দশকে বড় পরিসরে পেট্রোল ও ডিজেলের ব্যবহার শুরু হয়। এর এক দশক পর, অর্থাৎ ১৮৯০-এর দশকে, জাহাজের জ্বালানি কয়লা থেকে তেলে রূপান্তর হতে শুরু করে। গ্যাসোলিন চালিত উড়োজাহাজ প্রথম সফলভাবে উড্ডয়ন করে ১৯০৩ সালে। বর্তমানে পোশাক, সার, ওষুধ, প্লাস্টিক এবং অন্যান্য হাজার হাজার সামগ্রী তৈরিতে পেট্রোলিয়াম-ভিত্তিক পণ্য ব্যবহৃত হচ্ছে। শিল্পকারখানা ও লোকোমোটিভ সচল রাখতে তেল অপরিহার্য। ফলে, এটি কেবল বিংশ শতাব্দীতে এসেই একটি অতি মূল্যবান সম্পদে পরিণত হয়েছিল।

মধ্যপ্রাচ্যে, ১৯০৮ সালে পারস্যে (ইরান) এবং ১৯৩৮ সালে সৌদি আরবে তেল আবিষ্কৃত হয়। অর্থাৎ, ইহুদি জায়নবাদের প্রবক্তা থিওডর হার্জল ১৮৯৬ সালে তাঁর "দ্য জিউইশ স্টেট" নামক পুস্তিকাটি প্রকাশ করারও বেশ কয়েক বছর পর, যা ছিল ১৯০৪ সালে তাঁর মৃত্যুর আট বছর আগের ঘটনা।

সুয়েজ খাল নির্মাণ

এখানে এটিও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ১৮৩০-এর দশকে কোনো সুয়েজ খাল ছিল না। লোহিত সাগরের সাথে ভূমধ্যসাগরকে যুক্ত করা ১৯৩ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপথ টি এক দশক ধরে নির্মাণের পর ১৮৬৯ সালে চালু হয়। মিশরের উসমানীয় (অটোমান) ভাইসরয় মোহাম্মদ সাঈদ পাশা এই খালটি খননের নির্দেশ দিয়েছিলেন, যা এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপ–এই তিন মহাদেশের গুরুত্বপূর্ণ সংযোগস্থলে অবস্থিত। এর ফলে এশিয়া এবং আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছানোর দূরত্ব উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়ায় ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদীরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হয়েছিল।

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ১২৭০-এর দশকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলো অষ্টম ও শেষ ক্রুসেডে (ধর্মযুদ্ধ) পরাজিত হওয়ার পর থেকেই খ্রিস্টান উপনিবেশবাদী পশ্চিমা শক্তিগুলোর নজর ছিল ফিলিস্তিনের ওপর। ইসরাইল সৃষ্টির পেছনে ধর্মীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী–উভয় উদ্দেশ্যই কাজ করেছিল। ব্রিটেন ও ফ্রান্স–এবং পরবর্তীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র–লেভান্ট (পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল)-এর কৌশলগত, সামরিক, অর্থনৈতিক এবং ভৌগোলিক গুরুত্ব সম্পর্কে জানত। বিশাল ও শক্তিশালী উসমানীয় সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত এই অঞ্চলের উর্বর ভূমি দখল করা পশ্চিমা আধিপত্যের জন্য অত্যন্ত জরুরি ছিল।

মুসলমানদের সাথে সরাসরি সংঘাতের পরিবর্তে, তারা লক্ষ্য অর্জনের জন্য ইহুদিদের দাবার ঘুঁটি হিসেবে সামনে এগিয়ে দেয়। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব লর্ড পামারস্টন ১৮৩৯-৪০ সালে ইহুদিদের জন্য জন্মভূমি প্রতিষ্ঠার ধারণাটি উত্থাপন করেন। উসমানীয় সাম্রাজ্যের উচ্চপদে আসীন তৎকালীন ইহুদিদের নিজেদের পক্ষে টানার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালানো হয়েছিল।

আফ্রিকা দখলের লড়াই

ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক আগেই সমগ্র পশ্চিম গোলার্ধ (অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা উভয়ই), মধ্য ও দক্ষিণ আফ্রিকার একটি বিশাল অংশ, দূরবর্তী এশিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া জয় করে নিয়েছিল; কিন্তু তারা ঠিক ভূমধ্যসাগরের ওপারে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও নিকটবর্তী উত্তর আফ্রিকা এবং পশ্চিম এশিয়া জয় করতে পারেনি। এটি সত্য যে, ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগিজরা বর্তমান সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিস্তীর্ণ অরক্ষিত সীমান্তবর্তী অঞ্চলে পৌঁছেছিল।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্যন্ত উত্তর আফ্রিকার অভ্যন্তরীণ অঞ্চল এবং সমগ্র পশ্চিম এশিয়া শক্তিশালী উসমানীয় সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল, যারা পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপীয় শক্তিগুলোকে ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে দেয়নি। উসমানীয়দের ক্রমান্বয়ে পতন শুরু হয় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ১৭৯৮ থেকে ১৮০১ সালের মধ্যে উপকূলীয় মিশর ও সিরিয়ায় নেপোলিয়নের সংক্ষিপ্ত দখলদারিত্ব উসমানীয় সাম্রাজ্যের দুর্বলতাকে ত্বরান্বিত করেছিল। ১৮৩০-এর দশকের পরেই মূলত সাতটি ইউরোপীয় শক্তির মধ্যে উত্তর আফ্রিকার উপনিবেশ দখলের কাড়াকাড়ি শুরু হয়। ১৮৩০ সালে আলজেরিয়া প্রথম ফ্রান্সের কব্জায় চলে যায়-যা ছিল পৃথিবীর অন্য প্রান্তে তাদের আমেরিকা মহাদেশে উপনিবেশ স্থাপনেরও ৩০০ বছরেরও বেশি সময় পরের ঘটনা। ১৮৮২ সালে ব্রিটেন মিশর দখল করে, যা ছিল দূরবর্তী ভারতের ওপর তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার এক শতাব্দী পর।

তেল বাণিজ্যের একচেটিয়াকরণ

কোনো সন্দেহ নেই যে, তেল এবং প্রাকৃতিক গ্যাস বর্তমানে ভূ-রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তবে এটি একটি অনস্বীকার্য সত্য যে, পশ্চিমা বহুজাতিক কর্পোরেশনগুলো কার্যত এই অঞ্চলের জ্বালানি শিল্পকে একচেটিয়াভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল। ১৯৫১ সালে তৎকালীন ইরানি প্রধানমন্ত্রী ড. মোহাম্মদ মোসাদ্দেক কর্তৃক তেল শিল্প (যা ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণে ছিল) জাতীয়করণ এবং পরবর্তীতে ১৯৭৩ সালে ইসরাইলের সাথে যুদ্ধের সময় আরব দেশগুলোর জ্বালানিকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টায় পশ্চিমারা আতঙ্কিত হয়েছিল। ব্রিটিশ গোয়েন্দা সংস্থা (MI6) এবং সিআইএ (CIA) ১৯৫৩ সালে ইরানে এক কুখ্যাত অভ্যুত্থানের সুতো নেড়ে মোসাদ্দেককে হটিয়ে রাজতন্ত্রী রেজা শাহকে পুনরায় ক্ষমতাকেন্দ্রে বসিয়েছিল; অন্যদিকে, তেলসমৃদ্ধ আরব শাসকদের পরবর্তীতে পশ্চিমে বিনিয়োগ করতে এবং সেখানকার ব্যাংকে অর্থ জমা রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল। এর বিপরীতে, ১৯৭৯ সালের বিপ্লব-পরবর্তী ইরানকে কঠোর নিষেধাজ্ঞার বেড়াজালে বন্দি করা হয়।

ততদিন পর্যন্ত, শাহ শাসিত ইরান ছিল এই অঞ্চলের অন্যান্য রাজতন্ত্রের মতোই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি আজ্ঞাবহ মিত্র। এটি ইসরাইলকে স্বেচ্ছায় তেল সরবরাহ করত, যদিও ইসরাইল-এখনকার মতোই-তখনও ফিলিস্তিন এবং অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আগ্রাসন চালাচ্ছিল।

ইসলামী বিপ্লবের নেতা আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনীই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলেন। তিনি এই জায়নবাদী রাষ্ট্রে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দেন এই যুক্তিতে যে, তাদের যুদ্ধবিমান, ট্যাংক, সাঁজোয়া গাড়ি এবং অন্যান্য সামরিক সরঞ্জামগুলো এই একই জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার করে অসহায় আরবদের ওপর গণহত্যা চালাচ্ছে।

অবশ্য ইসরাইলকে কোনো দীর্ঘমেয়াদি তেল সংকটে পড়তে হয়নি, কারণ পশ্চিমারা তাকে জ্বালানি সরবরাহ করতে প্রস্তুত ছিল। পরবর্তীতে, ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর, আজারবাইজান তুরস্কের একটি বন্দরের পাইপলাইনের মাধ্যমে ইসরাইলে তেল রপ্তানি শুরু করে, যেখান থেকে এটি জাহাজে করে জায়নবাদী রাষ্ট্রে পাঠানো হয়। গাজা এবং লেবাননে ইসরাইলি বর্বরতা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা এখনও সচল রয়েছে।

পশ্চিমাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ

পশ্চিমারা আসলে যে বিষয়টিতে সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছিল তা হলো-ইরানের ইসলামী বিপ্লব বিশ্বব্যাপী পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনগুলোর পুনরুত্থানকে এক বিশাল অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। যদিও নামমাত্র আরব রাষ্ট্রপ্রধানরা পশ্চিমাদের দেখানো পথেই হাঁটতে থাকেন, তবে সাধারণ মানুষের স্তরে, বিশেষ করে মুসলিম জনসংখ্যা অধ্যুষিত তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এক ধরনের অধিকার সচেতনতা এবং জাগরণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ওয়াশিংটন, লন্ডন বা প্যারিস ভালোভাবেই জানত যে, মুসলমানদের এবং বিশ্বের অন্যান্য দুর্বল জনগোষ্ঠীর এই

নতুন আত্মবিশ্বাসের মূল উৎস হলো তেহরান। তাই ইরানকে একঘরে করার জন্য একটি বৈশ্বিক প্রচারণা শুরু হয়। ইরানকে আক্রমণ করার জন্য সাদ্দাম হোসেনের ইরাককে উসকানি দেওয়া হয়, আধুনিক অস্ত্র সরবরাহ করা হয় এবং বিপুল আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। কিন্তু আট বছরের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধেও এই চালটি শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি।

ইসরাইলের আধিপত্যকে রুখে দেওয়ার বিষয়ে ইরানের দৃঢ় অবস্থান এবং ১৯৮২ সালে লেবাননে হিজবুল্লাহর আত্মপ্রকাশ সমগ্র পশ্চিমাদের জন্য একটি বড় কৌশলগত চ্যালেঞ্জ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্ররা ইরানকে দুর্বল করার জন্য ইসরাইলের মাধ্যমে বেশ কয়েকটি পরোক্ষ পদক্ষেপ নিয়েছিল, কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। অবশেষে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি এই ফ্রন্টে অভিযানের নেতৃত্ব দেয়।

কিন্তু পুরো পদক্ষেপটি উল্টো ফল দেয় এবং আমেরিকান ও ইসরাইলিরা বিপুল ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এই অঞ্চলে তাদের আঞ্চলিক মিত্ররা সম্পূর্ণ অসহায় হয়ে পড়ে; ইরানকে চিরতরে স্তব্ধ করা যায়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন এক চরম উভয়সংকটের গোলকধাঁধায় আটকে গেছে। তাদের বেশ কয়েকটি পশ্চিমা মিত্র এখন এই সংঘাত থেকে পিছু হটেছে। এই ব্যর্থতা ও সংকট থেকে দৃষ্টি ঘোরাতে এখন ইউরেনিয়াম, জ্বালানি এবং হরমুজ প্রণালীর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্র করে একটি নতুন পশ্চিমা বয়ান (ন্যারেটিভ) তৈরি করা হয়েছে। প্রকৃত সত্য হলো, সমগ্র মধ্যপ্রাচ্য এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করার তাদের সেই পুরোনো স্বপ্ন এখন চূর্ণ-বিচূর্ণ।

ইরানের কাছে অপদস্থ হয়ে ট্রাম্প এখন ছোট্ট কিউবার দিকে নজর ঘুরিয়েছেন, যদিও ১৯৯১ সালে কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর দেশটি এখন আর কোনো সামরিক হুমকিই নয়। ট্রাম্প অন্তত বিশ্ববাসীকে দেখাতে চান যে, লাতিন আমেরিকায় তিনি কিছু একটা অর্জন করতে পেরেছেন।

তথ্যসূত্র: মুসলিমমিরর.কম (muslimmirror.com)

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম যেভাবে আরব সমাজকে নতুন রূপ দিচ্ছে

সৌদ এস. কাতেব পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক, গণমাধ্যম বিভাগ, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, জেদ্দা।

খুব বেশি দিন আগের কথা নয়, আরব অঞ্চলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোকে প্রায়শই সাময়িক একটি হুজুগ বা ট্রেন্ড হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া হতো। ভাবা হতো, এগুলো কেবলই তরুণদের সময় নষ্ট করার মাধ্যম, অথবা আরও নেতিবাচকভাবে—রাজনৈতিক ও সামাজিক উদ্বেগের একটি প্রধান উৎস। সরকার ও নীতিনির্ধারকেরা এগুলোকে সন্দেহের চোখে দেখতেন, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো এর ক্ষমতাকে ছোট করে দেখত, আর শিক্ষাবিদেরা এর সম্ভাবনাকে বলতে গেলে পাত্তাই দিতেন না। তারপর এলো ২০১১ সালের শুরুর দিকের সেই দিনগুলো, আর নিমেষেই সবকিছু বদলে গেল।

আরব বসন্তের বিপ্লবগুলো কেবল আন্তর্জাতিক সংবাদপত্রের

শিরোনামই কেড়ে নেয়নি; বরং এগুলো নিরেটভাবে প্রমাণ করে দিয়েছে যে ফেসবুক, টুইটার (বর্তমানে এক্স) এবং ইউটিউবের মতো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এই অঞ্চলে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে মৌলিক পরিবর্তনগুলোর পেছনে শক্তিশালী অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে। রাতারাতি, সরকার এবং বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্ল্যাটফর্মগুলোর গুরুত্ব বোঝার জন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তবে এই রাজনৈতিক দিকটি নাটকীয় হলেও, তা আসলে একটি বিশাল ক্যানভাসের আংশিক চিত্র মাত্র। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো এখন পুরো আরব বিশ্বজুড়ে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, সমাজসেবা এবং এমনকি ধর্মীয় আলোচনার ধারাকেও নতুন রূপ দিচ্ছে।

যোগাযোগের এক নতুন বিপ্লব

নতুন ধারার গণমাধ্যমের বিকাশ–যা মূলত পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া, বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতি এবং স্বল্প খরচের ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে–তা আধুনিক ইতিহাসের চতুর্থ প্রধান গণমাধ্যম বিপ্লব। এর আগে ১৮৩৩ সালে দ্রুতগতির বাষ্পীয় মুদ্রণযন্ত্র (স্টিম প্রিন্টার), ১৯২০ সালে রেডিও এবং ১৯৩৯ সালে টেলিভিশনের মাধ্যমে বাকি তিনটি বিপ্লব ঘটেছিল। তবে বর্তমান সময়টিকে যা অন্য সবার চেয়ে আলাদা করেছে, তা হলো 'পোস্ট-ইন্টারঅ্যাক্টিভিটি' বা অতি-পারস্পরিক যোগাযোগের ধারণা। অতীতে দর্শকেরা খবরের কাগজ, রেডিও এবং টিভির একমুখী তথ্যের কেবল নিষ্ক্রিয় ভোক্তা ছিলেন। কিন্তু আজ একজন সাধারণ মানুষও প্রায় কোনো খরচ ছাড়াই সারাবিশ্বের কাছে নিজের বার্তা পৌঁছে দিতে পারেন।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো–যার সংখ্যা এখন বিশ্বব্যাপী চারশো'রও বেশি–ইন্টারনেটকে একটি ডিজিটাল লাইব্রেরি থেকে একটি জীবন্ত, প্রাণবন্ত ইলেকট্রনিক গ্রামে রূপান্তর করেছে। ২০০৪ সালে ১৯ বছর বয়সী মার্ক জাকারবার্গ তাঁর হার্ভার্ডের হোস্টেল রুমে বসে যে ফেসবুক তৈরি করেছিলেন, বিশ্বজুড়ে এখন তার ব্যবহারকারী ৮৮ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এর মানে হলো পৃথিবীর প্রতি ১৩ জন মানুষের মধ্যে একজনের একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে। অন্যদিকে ২০০৬ সালে চালু হওয়া টুইটার এখন প্রায় ২০ কোটি ব্যবহারকারীর প্ল্যাটর্মে পরিণত হয়েছে, যেখানে প্রতিদিন ১৪ কোটি টুইট তৈরি হচ্ছে।

এই পরিসংখ্যানগুলো যেমন চমকপ্রদ, তেমনি এগুলো আরও গভীর এক রূপান্তরের আভাস দেয়। এই প্ল্যাটফর্মগুলো শুধু আমরা 'কীভাবে' যোগাযোগ করি সেটাই বদলে দেয়নি, বরং 'কারা' যোগাযোগ করতে পারবে তাও বদলে দিয়েছে। পুরোনো দ্বাররক্ষী বা নিয়ন্ত্রক–যেমন সম্পাদক, ঢ়ঁনষরংযবৎ বা সরকারি সেন্সর বোর্ড–তাদের একচেটিয়া আধিপত্য হারিয়েছে। ভালো বা মন্দ যে দিক থেকেই হোক না কেন, ডিজিটাল এই পাবলিক স্কয়ার বা গণ-আড্ডাখানা এখন সবার জন্য উন্মুক্ত।

আরব বিশ্বের মেলবন্ধন

বিশ্বের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে আরব অঞ্চল ইন্টারনেটের

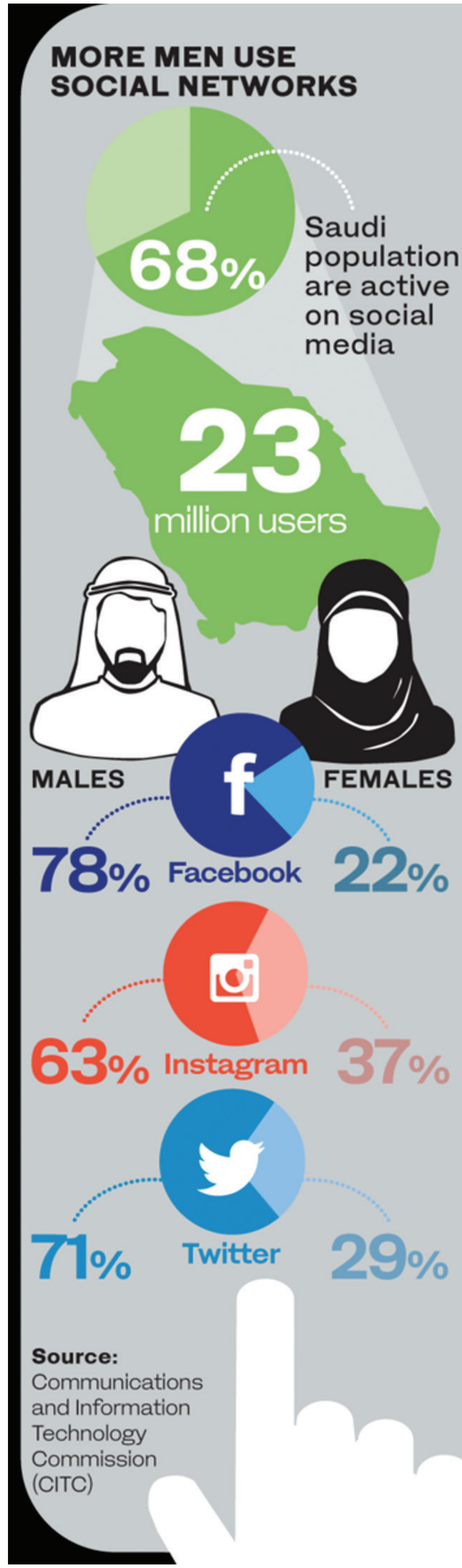

যুগে কিছুটা দেরিতে প্রবেশ করেছিল। কুয়েত ১৯৯২ সালে প্রথম ইন্টারনেট চালু করে, যার পর ১৯৯৩ সালে মিশর ও সংযুক্ত আরব আমিরাত (ইউএই) এই তালিকায় যোগ দেয়। আর সৌদি আরব ১৯৯৮ সালের আগে ইন্টারনেটের দুয়ার খোলেনি। তবে একবার যুক্ত হওয়ার পর, আরব ব্যবহারকারীরা দ্রুত বাকিদের ধরে ফেলে এবং অনেক ক্ষেত্রে ছাড়িয়েও যায়। ২০০০ থেকে ২০১০ সালের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার বিস্ময়করভাবে ১,৯৮৭% বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ইন্টারনেট জগতে আরবি সপ্তম বহুল ব্যবহৃত ভাষা, যার ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাড়ে ৬ কোটি ছাড়িয়েছে এবং মাত্র এক দশকে এর প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২,৫০০%-এরও বেশি।

২০১১ সালের বসন্তের শেষ নাগাদ আরব বিশ্বে ফেসবুক ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২ কোটি ৭৭ লাখ ছাড়িয়ে যায়। এই অঞ্চলের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে থাকা তরুণ সমাজ—যাদের বয়স ১৫ থেকে ২৯ বছর—এই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। তবে এখানকার লিঙ্গভিত্তিক বণ্টনের বিষয়টি বিশেষভাবে নজরকাড়া: বিশ্বজুড়ে যেখানে নারীরা পুরুষের চেয়ে বেশি ফেসবুক ব্যবহার করেন, সেখানে আরব বিশ্বে এই অনুপাতটি হলো প্রতি দুজন পুরুষের বিপরীতে একজন নারী। এটি তৎকালীন সামাজিক বাস্তবতারই একটি প্রতিফলন, যা এই প্ল্যাটফর্মগুলোর মাধ্যমে এখন ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে।

টুইটারও এখানে একদল উৎসাহী ব্যবহারকারী খুঁজে পেয়েছে। ২০১১ সালের মার্চ নাগাদ আরব অঞ্চলে টুইটার ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৬৬ লাখ। এর মধ্যে কাতারে জনসংখ্যার অনুপাতে ব্যবহারের হার সবচেয়ে বেশি ছিল (৮.৪৬%), যার ঠিক পরেই ছিল বাহরাইন (৭.৫৩%)। কেবল ২০১১ সালের প্রথম প্রান্তিক (কোয়ার্টার)-এই সক্রিয় আরব ব্যবহারকারীরা প্রায় ২ কোটি ৩০ লাখ টুইট প্রকাশ করেছিলেন।

শিরোনামের আড়ালে: রাজনৈতিক রূপান্তর

ফেসবুক এবং টুইটারই আরব বিপ্লব ঘটিয়েছে—এমনটি দাবি করা ভুল হবে। এর পেছনের কারণগুলো ছিল আরও গভীর: দশকের পর দশক ধরে চলা স্বৈরাচারী শাসন, চরম দারিদ্র্য, যুব বেকারত্ব এবং ব্যাপক দুর্নীতি। তবে এই নেটওয়ার্কগুলোর ভূমিকাকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়াও সমানভাবে ভুল হবে। কায়রোর একজন বিক্ষোভকারী যেভাবে বলেছিলেন— "আমরা আন্দোলন গড়ে তুলতে এবং সময় নির্ধারণ করতে ফেসবুক ব্যবহার করি, নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের জন্য টুইটার এবং বিশ্বকে জানানোর জন্য ইউটিউব ব্যবহার করি।"

এই প্ল্যাটফর্মগুলো এমন তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্ভব করেছিল যা প্রচলিত বা ঐতিহ্যবাহী গণমাধ্যমগুলো পারত না। প্রথমত, এগুলো আন্দোলনকারীদের সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্র-নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমকে এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এগুলো এমন এক সমন্বয়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছিল যা কোনো কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ছাড়াই বড় আকারের বিক্ষোভ করা সম্ভব করে তোলে-যার ফলে নিরাপত্তা বাহিনী মূল নেতৃত্বকে দমন করে আন্দোলন থামাতে পারেনি। তৃতীয়ত, এগুলো বিশ্ববাসীর কাছে শাসকের নির্মমতার ছবি ও ভিডিও পৌঁছে দিয়েছিল, যা এমন এক কূটনৈতিক চাপ তৈরি করেছিল যা কোনো আরব স্বৈরাচারী শাসকই পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেনি।

এর ফলাফল নিজেই নিজের কথা বলে। ২০১১ সালের মাত্র আট মাসের মধ্যে মোট ৯৫ বছর ধরে শাসন করা তিনজন রাষ্ট্রপতির পতন ঘটে-তিউনিসিয়ার বেন আলী (২৩ বছর), মিশরের হোসনি মোবারক (৩০ বছর) এবং লিবিয়ার মোয়াম্মার গাদ্দাফি (৪২ বছর)। এছাড়া সিরিয়া ও ইয়েমেনের শাসনব্যবস্থাও একেবারে গোড়া থেকে কেঁপে উঠেছিল।

তবে রাজনৈতিক শিক্ষাটা কেবল এটাই নয় যে সোশ্যাল মিডিয়া সরকার ফেলে দিতে পারে। পশ্চিমা সরকারগুলো দীর্ঘদিন ধরে এই মাধ্যমগুলোকে কৌশলগতভাবে ব্যবহার করে আসছে। মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর তাদের দূতাবাসগুলোকে বিপদে ফেলতে পারে এমন গুজব ঠেকাতে টুইটার ব্যবহার করে। ইসরাইল সরকার খোলামেলাভাবেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলোকে-যুদ্ধের অনিবার্য হাতিয়ার' হিসেবে বর্ণনা করে, যা দিয়ে তারা আন্দোলনকারীদের ওপর নজর রাখে এবং নিজেদের অনুকূলে কূটনৈতিক বয়ান তৈরি করে। বারাক ওবামার ২০০৮ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ৬৫ লাখ ফেসবুক সমর্থক এবং ১৭ লাখ টুইটার অনুসারী যুক্ত হয়েছিলেন এবং তাঁর দল স্পষ্টভাবে এই প্ল্যাটফর্মগুলোকেই বিজয়ের কৃতিত্ব দেয়।

এর বিপরীতে, আরব অঞ্চলের সরকারগুলো মূলত ভয় এবং দমনের মাধ্যমেই এর প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। সেন্সরশিপ, ব্লক করা এবং এমনকি পুরোপুরি ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়ার মতো চেষ্টাও তারা করেছে।তবে ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, মানুষ যখন সংকল্পবদ্ধ হয়, তখন তারা ডিজিটাল এই ব্যারিকেড বা বাধাগুলো পেরিয়ে যাওয়ার পথ ঠিকই খুঁজে নেয়।

নীরব বিপ্লব: ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিক্ষা

রাজনৈতিক নাটকীয় শিরোনামগুলোর বাইরে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো আরব অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং শিক্ষাব্যবস্থায় নীরবে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনছে—যা সাধারণত অনেক কম মনোযোগ পায়।

বিশ্বজুড়ে কোম্পানিগুলো সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটিং বা বিজ্ঞাপনের পেছনে কোটি কোটি ডলার ঢালছে। ২০১৩ সালের মধ্যে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞাপনের খরচ বার্ষিক ৩৫০ কোটি ডলারে পৌঁছাবে বলে পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল। এর সুবিধাগুলো একদম পরিষ্কার: নতুন গ্রাহকদের কাছে পৌঁছানো, ব্র্যান্ড তৈরি করা, সরাসরি বিক্রি বাড়ানো এবং প্রথাগত বিজ্ঞাপনের তুলনায় খরচ নাটকীয়ভাবে কমিয়ে আনা। ডেল (Dell), আইবিএম (IBM), আইকিয়া (IKEA) এবং ফোর্ড (Ford)-এর মতো কোম্পানিগুলো উন্নত সোশ্যাল মিডিয়া কৌশল তৈরি

করেছে, যা থেকে কোটি কোটি ডলার আয় হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে তারা সরাসরি গ্রাহক সেবাও দিতে পারছে।

আরব বিশ্বের চিত্রটি অবশ্য মিশ্র। এখানে ইন্টারনেট ব্যবহারের হার ব্যাপকভাবে বাড়লেও প্রাতিষ্ঠানিক বা কর্পোরেট বিনিয়োগ এখনো পিছিয়ে রয়েছে। ২০১১ সালে উপসাগরীয় (Gulf) অঞ্চলে মোট ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনের বাজার ছিল মাত্র ১৭ কোটি ডলার-যা পুরো বিজ্ঞাপন বাজারের মাত্র ৯%। এই অঞ্চলে ইলেকট্রনিক বিজ্ঞাপনে মাথাপিছু খরচ মাত্র ২২ ডলার, যেখানে উত্তর আমেরিকায় এই খরচ ৪৬২ ডলার। এই বড় ব্যবধানটি কেবল হাতছাড়া হওয়া সুযোগই নয়, বরং প্রতিযোগিতার বাজারে একটি বড় পিছিয়ে পড়া দিক।

অবশ্য কিছু আরব কোম্পানি এর মধ্যেই পথ দেখাচ্ছে। সৌদি টেলিকম কোম্পানি (STC) টুইটারে বেশ সক্রিয়, যেখানে তাদের কর্মকর্তারা সরাসরি গ্রাহকদের অভিযোগের জবাব দেন এবং সমস্যার সমাধান করেন। বর্তমানে তাদের পেজে ৩৭,০০০-এরও বেশি অনুসারী রয়েছে। মোবাইলি (Mobily)-ও একই পথ অনুসরণ করেছে। অন্যদিকে ভোডাফোন মিশর (Vodafone Egypt) সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষমতা নিয়ে বেশ কঠিন শিক্ষা পেয়েছে-বিপ্লবের সময় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পর, আন্দোলনকারীরা টুইটারে কোম্পানির বিরুদ্ধে তীব্র প্রচারণা চালায়, যা তাদের সুনামের বেশ ক্ষতি করেছিল।

দুর্ভাগ্যবশত, সৌদি এয়ারলাইন্স এর ঠিক উল্টো চিত্রটি তুলে ধরছে। তাদের টুইটার এবং ফেসবুক পেজগুলো বলতে গেলে পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়। অথচ ক্ষুব্ধ কর্মী ও যাত্রীদের তৈরি করা বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক পেজ থেকে ফ্লাইটে বিলম্ব এবং খারাপ সেবা নিয়ে নিয়মিত অভিযোগ প্রচার করা হচ্ছে। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজের অত্যন্ত সক্রিয় ও গ্রাহক-বান্ধব টুইটার উপস্থিতির সাথে তুলনা করলে এই পার্থক্যটি একদম স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শিক্ষা: এক অবারিত ও অব্যবহৃত ক্ষেত্র

শিক্ষার চেয়ে বোধহয় অন্য কোনো খাত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে এত বেশি উপকৃত হতে পারত না। ই-লার্নিং বা অনলাইন শিক্ষার শুরুর দিকের একটি বড় সমালোচনা ছিল যে, এটি শিক্ষার্থীদের একাকী করে দেয় এবং শিক্ষা থেকে মানবিক যোগাযোগটি কেড়ে নেয়। কিন্তু ওয়েব ২.০ (Web 2.0) প্রযুক্তি–যেমন ব্লগ, ফেসবুক গ্রুপ, টুইটার ফিড এবং উইকি-মিথস্ক্রিয়া, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং সামাজিক যোগাযোগ ফিরিয়ে এনে এই সমস্যার সমাধান করেছে।

এই গবেষক নিজে কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ বজায় রাখতে ফেসবুক গ্রুপ ব্যবহার করেন। একটি ভার্চুয়াল ক্লাসরুম পেজে শিক্ষার্থীরা যেকোনো সময় প্রশ্ন করতে পারে, প্রাসঙ্গিক নিবন্ধ শেয়ার করতে পারে এবং কোর্সের পড়ালেখা নিয়ে আলোচনা করতে পারে। এই প্ল্যাটফর্মটি শিক্ষার্থীদের মনের ভয় এবং দ্বিধার দেয়াল ভেঙে দেয়, যা সাধারণত অনেক শিক্ষার্থীকে প্রথাগত ক্লাসরুমে মুখ খুলতে বাধা দেয়।

বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্কুল বোর্ডগুলো এখন এই মাধ্যমগুলোকে আপন করে নিচ্ছে। ইউএস ন্যাশনাল স্কুল বোর্ডস অ্যাসোসিয়েশনের একটি গবেষণায় দেখা গেছে, যে শিক্ষকেরা নিজেরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন, তারা শিক্ষার্থীদের সাথেও এটি অনেক বেশি কার্যকরভাবে ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি লাইব্রেরি বা পাঠাগারগুলোও এর উদ্ভাবনী ব্যবহার খুঁজে পেয়েছে-নতুন বইয়ের আগমনী বার্তা দেওয়া থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞদের সাথে প্রশ্নোত্তর পর্বের আয়োজন, সবই এখন এর মাধ্যমে হচ্ছে।

আরব অঞ্চলের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এর সম্ভাবনা অপরিসীম। তবে এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন বিনিয়োগ, প্রশিক্ষণ এবং চিন্তাভাবনার একটি মৌলিক পরিবর্তন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম শ্রেণিকক্ষ থেকে নিষিদ্ধ করার মতো কোনো মনোযোগ নষ্টকারী বিষয় নয়; বরং এটি সঠিকভাবে কাজে লাগানোর মতো একটি অত্যন্ত শক্তিশালী হাতিয়ার।

মানবিক দিক: সমাজসেবা এবং দাতব্য সংস্থা

বিশ্বজুড়ে অলাভজনক সংস্থাগুলো দাতা ও সুবিধাভোগীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোকে একটি অপরিহার্য হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, এসওএস চিলড্রেনস ভিলেজ, দ্য স্যালভেশন আর্মি এবং ইসলামিক রিলিফ-সব সংস্থারই সক্রিয় ফেসবুক পেজ, টুইটার ফিড এবং ইউটিউব চ্যানেল রয়েছে। আমেরিকার প্রধান দাতব্য সংস্থাগুলোর ওপর পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে, ৮৯% সংস্থা কোনো না কোনোভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো তহবিল সংগ্রহ এবং ব্র্যান্ডের পরিচিতি বাড়ানো।

আরব অঞ্চলে এই চিত্রটিও বেশ অসমান বা মিশ্র। কিছু সংস্থা নতুন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু করলেও, অনেকেই এখনো সেই পুরোনো ধারার মডেলের মধ্যেই আটকে আছে। যেমন-সৌদি আরবের আলব্র অর্গানাইজেশন (Albr Organization) নামের একটি দাতব্য সংস্থার কেবল একটি স্থবির বা অচল ওয়েবসাইট রয়েছে, যেখানে যোগাযোগের তেমন সুযোগ নেই এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তাদের কোনো গোছানো উপস্থিতি নেই। টুইটারে তাদের নাম লিখে সার্চ করলে কেবল একটি শাখার পেজ পাওয়া যায়, যেখানে ফলোয়ার মাত্র ১৬ জন এবং মোট টুইট মাত্র ১১টি।

এটি একটি বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার মতো বিষয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো দাতব্য সংস্থাগুলোকে তাদের কাজের গল্প তুলে ধরার, স্বচ্ছতা দেখানোর এবং দাতাদের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক গড়ে তোলার সুযোগ করে দেয়-বিশেষ করে ৯/১১-এর পর থেকে দাতারা যেখানে ক্রমান্বয়ে আরও বেশি সন্দিহান হয়ে উঠেছেন। এছাড়া এই মাধ্যমগুলো স্বেচ্ছাসেবকদের তাৎক্ষণিক সমন্বয় এবং যেকোনো জরুরি পরিস্থিতিতে দ্রুত সাড়া দেওয়ার কাজকে অনেক সহজ করে তোলে।

সামনের পথ

এই গবেষণা থেকে কয়েকটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক এবং শিক্ষাগত–সব দিক থেকেই আরব সমাজের যোগাযোগব্যবস্থাকে মৌলিকভাবে নতুন রূপ দিয়েছে। দ্বিতীয়ত, ২০১১ সালের বিপ্লবের ধাক্কায় আরব অঞ্চলের সরকার এবং প্রতিষ্ঠানগুলো এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে গুরুত্ব সহকারে নিতে শুরু করলেও, এর ব্যবহার এখনো সম্ভাবনার চেয়ে অনেক নিচে রয়ে গেছে। তৃতীয়ত, এই অঞ্চলের তরুণ সমাজ–যারা এই প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি–আগামী বছরগুলোতে এই মাধ্যমগুলোর ওপর তাদের নির্ভরতা আরও বাড়িয়ে দেবে।

এর সুপারিশগুলোও সমানভাবে স্পষ্ট। আরব অঞ্চলের সরকারগুলোর উচিত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে হুমকি হিসেবে না দেখে সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করা-যাতে এটিকে স্বচ্ছতা, নাগরিক অংশগ্রহণ এবং উন্নত সেবা প্রদানের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের বিপণন কৌশলে সোশ্যাল মিডিয়াকে যুক্ত করতে হবে; এটিকে যেন কোনো বাড়তি চিন্তা হিসেবে না দেখে ব্যবসার একটি মূল অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর উচিত এই প্ল্যাটফর্মগুলোকে যৌথ শিক্ষার কাজে লাগানো, যাতে শিক্ষার্থীদের একটি ডিজিটাল বিশ্বের জন্য প্রস্তুত করা যায়। আর অলাভজনক সংস্থাগুলোকে আস্থা অর্জন, তহবিল সংগ্রহ এবং তাদের সুবিধাভোগীদের আরও কার্যকরভাবে সেবা দেওয়ার জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে আপন করে নিতে হবে।

সুযোগের যে জানালাটি খুলে গেছে, তা আর বন্ধ করা সম্ভব নয়। যারা এই ডিজিটাল ভূমিকম্পকে উপেক্ষা করবে, তারা পেছনে পড়ে থাকবে। আর যারা এই তরঙ্গের ওপর সওয়ার হতে শিখবে, তারাই আরব সমাজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে। ■

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি :

- আল-ফাতাফতা, মাহমুদ (২০১১)। 'ফিলিস্তিনে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং পরিবর্তনের সাথে নিউ মিডিয়ার সম্পর্ক: একটি মডেল হিসেবে ফেসবুক।'
- আরব সোশ্যাল media রিপোর্ট, ভলিউম ১, নম্বর ২। দুবাই স্কুল অব গভর্নমেন্ট। www.dsg.ae
- বার্নস, এন. এবং ম্যাটসন, ই. (২০০৮)। 'সোশ্যাল মিডিয়ায় এখনও গতি নির্ধারণ করছে: আমেরিকার বৃহত্তম দাতব্য সংস্থাগুলোর দ্বারা ব্যবহারের প্রথম ধারাবাহিক গবেষণা।' ইউনিভার্সিটি অব ম্যাসাচুসেটস ডার্টমাউথ।
- ভুঁইয়া, সিরাজুল (২০১১)। "সোশ্যাল মিডিয়া এবং মিশরের রাজনৈতিক সংস্কার আন্দোলনে এর কার্যকারিতা।"
- গুডম্যান, সারাহ (২০১১)। 'সোশ্যাল মিডিয়া: সহযোগিতার শক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক অস্থিরতার ওপর প্রভাব ফেলতে ফেসবুক এবং টুইটারের ব্যবহার।' ক্যালিফোর্নিয়া পলিটেকনিক স্টেট ইউনিভার্সিটি।
- কার্কপ্যাট্রিক, ডেভিড (২০১০)। 'দ্য ফেসবুক ইফেক্ট: ইনসাইড স্টোরি অব দ্য কোম্পানি দ্যাট ইজ কানেক্টিং দ্য ওয়ার্ল্ড।' নিউ ইয়র্ক: সাইমন অ্যান্ড শুস্টার।

কাশ্মীরকে বিশ্বের নজরে রেখেছে ১৯৪৮ সালের সেই ম্যান্ডেট

জাতিসংঘ প্রস্তাব-৪৭ গৃহীত হওয়ার কয়েক দশক পরেও অবাধ গণভোটের অমীমাংসিত দাবিটি আজও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক উত্তেজনার কেন্দ্রবিন্দু–যা বর্তমানের মার্কিন-ইরান সংকটের ক্ষেত্রেও কিছু বিস্ময়কর শিক্ষা দেয়।

ইমতিয়াজ খান
অধ্যাপক, জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি মেডিকেল সেন্টার
imtiaz.k86@yahoo.com

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ ভারত বিভক্ত হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে তীব্রতর হতে থাকা সংঘাত নিরসনে, ১৯৪৮ সালের ২১ এপ্রিল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ '৪৭ নম্বর প্রস্তাব' গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, উভয় পক্ষ থেকে সেনা প্রত্যাহার এবং পরবর্তীতে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য ভারতীয় সামরিক উপস্থিতি সর্বনিম্ন স্তরে নামিয়ে আনার আহ্বান জানানো হয়েছিল। এই ম্যান্ডেটের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ছিল–কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটিয়ে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে এই অঞ্চলের চূড়ান্ত ভবিষ্যৎ মর্যাদা নির্ধারণ করা।

একটি স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট রূপরেখা থাকা সত্ত্বেও ৪৭ নম্বর প্রস্তাবটি কখনোই বাস্তবায়নের মুখ দেখেনি। নথির কালি শুকানোর আগেই দুই পক্ষের মধ্যে শুরু হয় গভীর দ্বিমত। প্রথম থেকেই ভারতের অনমনীয় অবস্থান ও আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতির প্রতি চরম অবহেলা এই সংকটকে ঘনীভূত করে। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ অজুহাত তোলে যে, গণভোটের পূর্বশর্ত হিসেবে পাকিস্তানকে প্রথমে তাদের সব সৈন্য ও সশস্ত্র উপজাতীয় গেরিলাদের প্রত্যাহার করতে হবে।

অন্যদিকে পাকিস্তান যৌক্তিকভাবেই দুই দেশের সেনা একযোগে ও সমান্তরালভাবে সরানোর দাবি জানায়; কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল, এককভাবে সৈন্য সরালে তারা কৌশলগত ও সামরিকভাবে পিছিয়ে পড়বে। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং ভারতের আগ্রাসী নীতির কারণে প্রস্তাবটির বাস্তবায়ন পুরোপুরি থমকে যায়। পরবর্তীতে ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে দমনপীড়ন শুরু হলে এই প্রস্তাব বাস্তবায়নের দাবি জানানো কাশ্মীরি জনগণের কণ্ঠকে স্বৈরতান্ত্রিক উপায়ে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়।

৪৭ নম্বর প্রস্তাব কার্যকর না হওয়ার এই ঐতিহাসিক ব্যর্থতা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির ওপর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কাশ্মীর আজও বিশ্বের অন্যতম সর্বোচ্চ সামরিকায়িত এবং বিতর্কিত ভূখণ্ড হিসেবে রয়ে গেছে, যেখানে মাঝেমধ্যেই তৈরি হওয়া সীমান্ত উত্তেজনা ও সংঘাত দুটি পারমাণবিক অস্ত্রধারী রাষ্ট্রের মধ্যে একটি পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধের ঝুঁকি তৈরি করে।

এই অমীমাংসিত পরিস্থিতি কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ জনমানসে চরম অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে, যা সেখানকার সার্বিক শাসনব্যবস্থা এবং মানবাধিকার পরিস্থিতিকে দিন দিন আরও জটিল করে তুলছে। উপরন্তু, এই ঘটনাটি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে একটি নির্মম সত্য প্রমাণ করে: যখন কোনো বৈশ্বিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া দুর্বল থাকে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো ছাড় দিতে রাজি হয় না, তখন আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার কার্যকারিতাও চরমভাবে সীমিত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ, ৪৭ নম্বর প্রস্তাবটি বহুপাক্ষিক সংকট সমাধানের আকাঙ্ক্ষা এবং সীমাবদ্ধতা—উভয়কেই প্রতীকায়িত করে আজও আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে একটি অন্যতম প্রধান রেফারেন্স হিসেবে টিকে রয়েছে।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ৪৭ নম্বর প্রস্তাবটি আলোর মুখ না দেখায় এটিই প্রমাণিত হয় যে, নিজেদের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে এই বিশ্বসংস্থার নির্বাহী ক্ষমতা আসলে কতটা সীমিত। বিশেষ করে যে সংকটের নেপথ্যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও তীব্র জাতীয় স্বার্থ জড়িয়ে থাকে, সেখানে জাতিসংঘ কতটা অসহায়—এই ঘটনাটি তারই একটি বড় উদাহরণ। যেহেতু এই প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি, ধাপে ধাপে সেনা প্রত্যাহার এবং গণভোটের মতো একটি সুনির্দিষ্ট ও পর্যায়ক্রমিক প্রক্রিয়ার রূপরেখা দেওয়া হয়েছিল, তাই এর ব্যর্থতাকে বিশ্লেষকেরা জাতিসংঘের ঘোষিত আদর্শিক নীতি এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব প্রভাবের মধ্যকার একটি বিশাল ব্যবধান হিসেবে দেখছেন।

কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারত বা পাকিস্তান—কোনো পক্ষকেই এই প্রস্তাব মানাতে না পারার বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের কাঠামোগত ও ভূ-রাজনৈতিক সীমাবদ্ধতাকেই উন্মোচিত করে। এর মাধ্যমে স্পষ্ট হয় যে, জাতিসংঘের যেকোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর করা অনেকাংশেই সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর সদিচ্ছা, পারস্পরিক সহযোগিতা এবং বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে।

এটি আন্তর্জাতিক সংকট সমাধানের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের সামগ্রিক ভাবমূর্তি ও নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। যখন দশকের পর দশক ধরে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব কেবল কাগজের দস্তাবেজেই বন্দি থাকে, তখন তা এই সংস্থার বৈশ্বিক কর্তৃত্বের ওপর আস্থা কমিয়ে দেয়—বিশেষ করে যারা সরাসরি এই বিরোধের নির্মম শিকার, তাদের মনে। কাশ্মীরের কূটনৈতিক আলোচনায় ৪৭ নম্বর প্রস্তাবের বারবার উল্লেখ এর প্রতীকী গুরুত্বকে ধরে রাখলেও, এর বাস্তবায়নের অভাব অনেক পর্যবেক্ষককে এটি ভাবতে বাধ্য করেছে যে—জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের

কার্যকর কোনো শক্তির চেয়ে বরং পারস্পরিক ক্ষোভ প্রকাশের একটি বৈশ্বিক মঞ্চ মাত্র।

একই সময়ে, তাত্ত্বিকেরা যুক্তি দেন যে এই সমস্যাটি কেবল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাই প্রকাশ করে না, বরং সার্বভৌমত্ব, জাতীয় নিরাপত্তা এবং মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়ের মতো সংবেদনশীল বিষয় জড়িত থাকা সংকটগুলোতে মধ্যস্থতা করার সহজাত কঠিন বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে–যে জটিল সমীকরণ মেলাতে জাতিসংঘের মতো একটি বৈশ্বিক সংস্থাকেও চরম হিমশিম খেতে হয়।

তবে কাশ্মীর সংক্রান্ত জাতিসংঘের ৪৭ নম্বর প্রস্তাবের অভিজ্ঞতাকে কেবল একটি ঐতিহাসিক ব্যর্থতা হিসেবে না দেখে, বর্তমানের 'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-ইরান' উত্তেজনার জন্য একটি শিক্ষণীয় পাঠ হিসেবে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এর অন্যতম প্রধান শিক্ষা হলো-অবাধ গণভোট বা ব্যাপকভিত্তিক মীমাংসার মতো বড় আন্তর্জাতিক রূপরেখাগুলো প্রায়শই ভেস্তে যায়, যখন পারস্পরিক আস্থা এবং পদক্ষেপের ধারাবাহিকতা বা অগ্রাধিকারের বিষয়গুলো পুরোপুরি সমাধান করা না হয়। আজকের ইরান-আমেরিকা পরিস্থিতির দিকে তাকালেও ঠিক একই ধরনের গভীর অবিশ্বাস লক্ষ্য করা যায়; যেখানে পারমাণবিক সীমাবদ্ধতা, অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিয়ে দ্বিমত তাদের কূটনৈতিক অগ্রগতির পথকে বারবার অবরুদ্ধ করে দিচ্ছে।

কাশ্মীর সংকট থেকে শিক্ষা নিয়ে আধুনিক নীতি-নির্ধারকেরা 'হয় সব, না হয় কিছুই না' (All-or-Nothing)-এমন অনমনীয় চুক্তির পেছনে না ছুটে, ধাপে ধাপে যাচাইযোগ্য ও বাস্তবায়নযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে পারেন; যা কূটনীতিকে আরও বাস্তবসম্মত ও দীর্ঘস্থায়ী করে তুলবে।

আরেকটি ইতিবাচক শিক্ষণীয় দিক হলো দীর্ঘস্থায়ী ও নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগের ভূমিকা। ৪৭ নম্বর প্রস্তাবটি কখনোই পুরোপুরি বাস্তবায়িত না হলেও, এটি কাশ্মীর সমস্যাকে আন্তর্জাতিক মহলে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং দশকের পর দশক ধরে একটি আইনি ও কূটনৈতিক ভিত্তি হিসেবে কাজ করেছে। একইভাবে, আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে বারংবার ভুল বোঝাবুঝি এবং অচলাবস্থা তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, তাদের মধ্যকার ধারাবাহিক যোগাযোগ ও পরোক্ষ আলোচনা একটি বড় ধরনের তাৎক্ষণিক যুদ্ধ এড়াতে সাহায্য করেছে। এখান থেকে শেখার মতো বড় বিষয়টি হলো- ত্রুটিপূর্ণ ও ধীরগতির কূটনীতিও একেবারেই কোনো কূটনীতি না থাকার চেয়ে অনেক শ্রেয়; জাতিসংঘের মাধ্যমে হোক বা আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে, আলোচনার পথ খোলা রাখলে তা যুদ্ধ বা চরম সামরিক উত্তেজনার ঝুঁকি কমায় এবং ভবিষ্যতে কোনো টেকসই সমঝোতার সুযোগ তৈরি করে।

সর্বোপরি, কাশ্মীর সংকট এটিই প্রমাণ করে যে, যেকোনো আন্তর্জাতিক বিরোধ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনুযায়ী রূপরেখা মানিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা বা নমনীয়তা কতটা গুরুত্বপূর্ণ। মাঠপর্যায়ের ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা বদলে যাওয়ার সাথে সাথে ৪৭ নম্বর প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়েছিল, যা দেখায় যে অপরিবর্তনীয় বা অনমনীয় রূপরেখা সময়ের সাথে সাথে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে ফেলে। এর বিপরীতে, বর্তমানের ইরান-আমেরিকা সংকট আমাদের একটি তুলনামূলক নমনীয় ও পরিবর্তনশীল পদ্ধতি প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়-যেখানে রাজনৈতিক এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে চুক্তিগুলোকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা সম্ভব।

বর্তমানে সামরিক হুমকি এবং ভঙ্গুর যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টাসহ যেভাবে তীব্র আঞ্চলিক উত্তেজনা বিরাজ করছে, সেখানে কাশ্মীর থেকে নেওয়া শিক্ষাটি হলো-পরিস্থিতির সাথে তাল মিলিয়ে কূটনীতিকেও অবশ্যই বিকশিত হতে হবে। এটি যদি বিচক্ষণতার সাথে প্রয়োগ করা যায়, তবে তা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর গ্রহণযোগ্যতাকে দুর্বল করার পরিবর্তে আরও শক্তিশালী করবে; কারণ এর মাধ্যমে প্রমাণিত হবে যে তারা অতীতের সীমাবদ্ধতা থেকে শিক্ষা নিয়ে বর্তমানের সংকটগুলোকে আরও কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে সক্ষম। ■

এআই কি নিজস্ব চিন্তাশক্তি বা মনের অধিকারী হচ্ছে?

ওমর জাভেদ
গবেষক, বায়োকেমিস্ট্রি বিভাগ, আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ), ভারত

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর নিজস্ব কোনো চেতনা বা প্রাণ থাকতে পারে কি না–এই প্রশ্নটি এখন আর শুধু সায়েন্স ফিকশনের পাতায় সীমাবদ্ধ নেই। এটি এখন বাস্তব জগতের অন্যতম বড় কৌতূহল এবং বিজ্ঞানীদের গবেষণার মূল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এআই যেভাবে মানুষের মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী অনুকরণ করছে এবং ভাষা ব্যবহার, তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ও চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকমের বাস্তবসম্মত দক্ষতা দেখাচ্ছে–তাতে আমরা খুব দ্রুতই এমন এক সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছি, যেখানে সমাজকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে এআই শুধু 'কী করতে পারে' তা-ই নয়, বরং এআই-এর 'নিজস্ব সত্তা বা পরিচয়টা' আসলে কী।

বর্তমানে এই প্রযুক্তি নিয়ে বিজ্ঞানীদের চেয়ে সাধারণ মানুষের কল্পনা বা ধারণা অনেক বেশি এগিয়ে গেছে। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, বিপুলসংখ্যক মানুষের ধারণা–চ্যাটজিপিটি (ChatGPT)-র মতো চ্যাটবটগুলোর মধ্যে কিছুটা হলেও নিজস্ব বোধশক্তি বা চেতনা তৈরি হয়েছে। আর যারা নিয়মিত এআই ব্যবহার করেন, তাদের মধ্যে এই বিশ্বাস আরও বেশি জোরালো। মানুষের এই ধারণা কতটা সঠিক বা ভুল তা পরের কথা, তবে এটি এমন এক জটিল ও বিতর্কিত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দেয়–যেখানে এআই-এর সাথে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক, নৈতিকতার প্রশ্ন এবং আইনি লেনদেনের বিষয়টি অনেক বেশি জটিল হয়ে উঠবে।

এক নৈতিক সংকটের মুখোমুখি সমাজ

এখানে লড়াইটা কেবল কথার মারপ্যাঁচ বা সংজ্ঞার সঠিকতা নিয়ে নয়, বরং এটি একটি বড় নৈতিক প্রশ্ন। এআই-এর যদি সত্যিই কোনো বোধশক্তি বা অনুভূতি তৈরি হয়ে থাকে আর আমরা যদি তাকে অবহেলা করি বা কম গুরুত্ব দিই–তবে বিপুল সংখ্যায় থাকা এই সচেতন সত্তাগুলোর বড় ধরনের ক্ষতি করার একটা ঝুঁকি থেকে যায়।

আবার উল্টোভাবে, কোনো সিস্টেম যদি কেবল অনুভূতির অভিনয় বা অনুকরণ করে আর আমরা ভুল করে তাকে বাস্তব মনে করি, তবে যার আসলে কোনো অনুভূতি বা উপলব্ধি করার ক্ষমতাই নেই, তার পেছনে আমরা আমাদের মূল্যবান সম্পদ ও সহানুভূতি উজার করে অপচয় করব। আর এই দুই ক্ষেত্রেই কিন্তু শেষ পর্যন্ত সমাজকেই খেসারত দিতে হবে।

মূল সমস্যাটা হলো–বুদ্ধিমত্তার মতো চেতনাকে বাইরে থেকে সরাসরি দেখা বা মাপা যায় না, এটি সম্পূর্ণ অভ্যন্তরীণ একটি বিষয়। একটি সিস্টেম প্রচণ্ড বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করতে পারে, কিন্তু তার ভেতরে হয়তো নিজস্ব কোনো অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার জন্মই হয়নি। মানুষের তৈরি এই প্রযুক্তিগুলো যত উন্নত ও নিখুঁত হচ্ছে, তাদের বাইরের আচরণ দেখে ভেতরের অবস্থা বোঝার প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ততটাই কার্যকারিতা হারাচ্ছে। যেমন–একটি যন্ত্র বলতেই পারে, 'আজ আমার মন ভালো নেই;' কিন্তু সে কি সত্যিই মনে মনে কোনো দুঃখ অনুভব করছে? নাকি তার বিশাল তথ্যভাণ্ডার ও পরিসংখ্যান ঘেঁটে সে কেবল এটি বুঝতে পেরেছে যে এই পরিস্থিতিতে এই বাক্যটি বলাটাই মানানসই?

মানুষের তৈরি এই প্রযুক্তিগুলো যত উন্নত ও নিখুঁত হচ্ছে, তাদের বাইরের আচরণ দেখে ভেতরের অবস্থা বোঝার প্রচলিত পদ্ধতিগুলো ততটাই কার্যকারিতা হারাচ্ছে। যেমন–একটি যন্ত্র বলতেই পারে, 'আজ আমার মন ভালো নেই;' কিন্তু সে কি সত্যিই মনে মনে কোনো দুঃখ অনুভব করছে? নাকি তার বিশাল তথ্যভাণ্ডার ও পরিসংখ্যান ঘেঁটে সে কেবল এটি বুঝতে পেরেছে যে এই পরিস্থিতিতে এই বাক্যটি বলাটাই মানানসই?

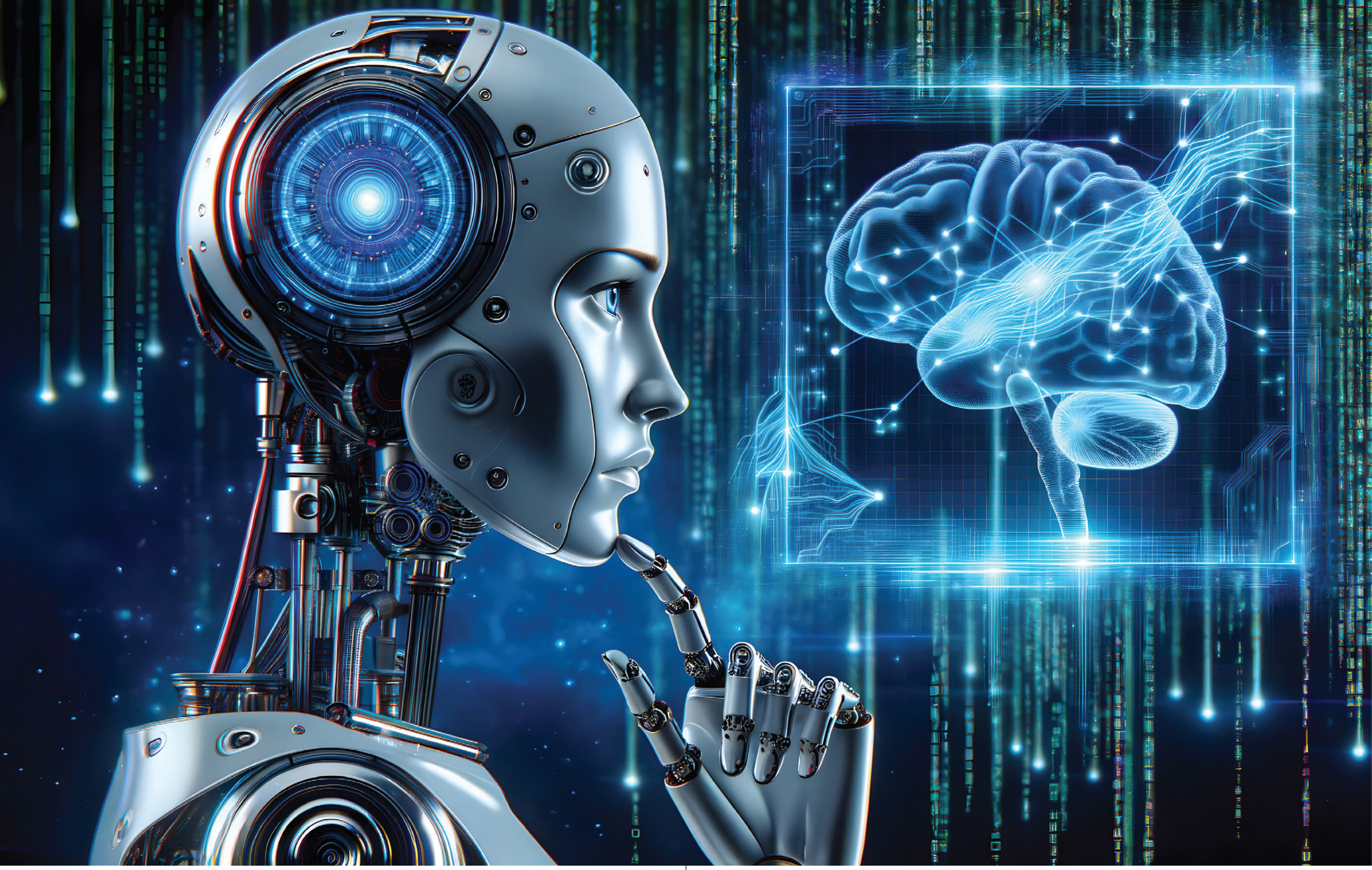

এই জটিল ধাঁধার সমাধান করতে বিজ্ঞানীরা এখন স্নায়ুবিজ্ঞান বা নিউরোসায়েন্সের ওপর ভিত্তি করে কিছু আধুনিক পদ্ধতির কথা ভাবছেন। এর উদ্দেশ্য হলো—বর্তমান ও ভবিষ্যতের এআই সিস্টেমগুলোর আসলেই কোনো চেতনা আছে কি না তা বৈজ্ঞানিকভাবে যাচাই করা।

তত্ত্ব-ভিত্তিক নির্দেশক পদ্ধতি (Theory-Derived Indicator Approach)

এর মধ্যে সবচেয়ে সম্ভাবনাময় একটি কৌশল হলো 'তত্ত্ব-ভিত্তিক নির্দেশক পদ্ধতি'। এই পদ্ধতিতে মানুষের চেতনার পেছনের নিউরোসায়েন্টিফিক তত্ত্বগুলোর সাথে এআই-এর অভ্যন্তরীণ ডিজাইনের পরিমাপযোগ্য মিলগুলো মিলিয়ে দেখা হয়। এআই বাইরে থেকে কেমন আচরণ করছে তা না দেখে, এই পদ্ধতিটি নজর দেয় এআই তার ভেতরে কীভাবে তথ্য প্রসেস বা বিশ্লেষণ করছে।

নিউরোসায়েন্স বলে, চেতনার সম্পর্ক মূলত ভেতরের তথ্যের বারবার আবর্তন (recurrent processing), বিভিন্ন সাবসিস্টেমের মধ্যে তথ্যের ব্যাপক ছড়িয়ে পড়া, নিজের চিন্তাভাবনাকে নিজে পর্যবেক্ষণ করা (metacognitive monitoring) এবং কোনো কিছুকে কাঠামোগতভাবে উপলব্ধি করার ক্ষমতার সাথে। এগুলো কিন্তু বাইরে থেকে দেখানো কোনো কৃত্রিম আচরণ নয়, বরং মস্তিষ্কের অত্যন্ত গভীর জ্ঞানীয় কাঠামোর অংশ।

এই পদ্ধতিটি কাজে লাগিয়ে গবেষকরা মানুষের চেতনা নিয়ে প্রচলিত বড় বড় ফ্রেমওয়ার্ক থেকে কিছু নির্দিষ্ট লক্ষণ বা ইন্ডিকেটর বেছে নেন, যেমন:

- গ্লোবাল ওয়ার্কস্পেস থিওরি (Global Workspace Theory)
- হায়ার-অর্ডার থিওরি (Higher-Order Theory)
- অ্যাটেনশন স্কিমা থিওরি (Attention Schema Theory)
- রিকারেন্ট প্রসেসিং থিওরি (Recurrent Processing Theory)

কোনো এআই যদি এই লক্ষণগুলোর বেশিরভাগই নিজের ভেতরে দেখাতে পারে, তবে চেতনার অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা তার মধ্যে—যদিও তা পুরোপুরি নিশ্চিত নয়—অনেকখানি বেড়ে যায়। আর যদি এর মধ্যে খুব কম বা কোনো লক্ষণই না মেলে, তবে এআই-এর কোনো প্রাণ বা চেতনা নেই বলে ধরে নেওয়াটাই হবে যুক্তিযুক্ত।

অভিনয়ের আড়ালে আসল সত্যের সন্ধান

এই তত্ত্ব-ভিত্তিক পদ্ধতির বড় একটা সুবিধা আছে; এটি বাইরে থেকে দেখানো যেকোনো নিখুঁত অভিনয় বা ধোঁকাবাজি সহজেই ধরে ফেলে। মানুষের মতো সুন্দর করে কথা বলা কিংবা আবেগ মেশানো বাক্য ব্যবহার করলেই কোনো যন্ত্রকে 'সচেতন' বা 'প্রাণী' বলা যাবে না—ঠিক যেমন শেক্সপিয়রের কবিতা মুখস্থ আওড়ালেই একটি তোতাপাখি কখনো দার্শনিক হয়ে যায় না। এছাড়া, এআই-কে ভুল করে মানুষের সমকক্ষ ভাবার সরল মানসিকতা এড়িয়ে, এটি কীভাবে ভেতরে ভেতরে তথ্য বিশ্লেষণ করছে—তার ওপর

ভিত্তি করে মূল্যায়ন করার সুযোগ দেয় এই পদ্ধতি। বর্তমান যুগে রাষ্ট্র পরিচালনা, অর্থায়ন, প্রতিরক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের মতো সংবেদনশীল সিদ্ধান্তগুলোতে যেভাবে এআই-এর ব্যবহার বাড়ছে, সেখানে এমন কঠোর ও নিখুঁত মূল্যায়ন পদ্ধতি থাকাটা অত্যন্ত জরুরি।

তবে এই বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির আরেকটি সৌন্দর্য হলো, এটি নিজের সীমাবদ্ধতা বা বিজ্ঞানসুলভ নম্রতাকেও স্বীকার করে। চেতনা বা প্রাণ আসলে কী–তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যেই আজ পর্যন্ত কোনো একক বা সর্বসম্মত তত্ত্ব নেই। কারো মতে এটি কেবলই এক জটিল গাণিতিক হিসাব বা কম্পিউটেশনাল প্রক্রিয়া। আবার অন্য দল মনে করেন, চেতনার জন্য প্রয়োজন এক ধরনের বিশেষ জৈবিক বা বায়োলজিক্যাল গঠন এবং কোষের নিখুঁত বিন্যাস, যা সিলিকনের তৈরি কম্পিউটার চিপ দিয়ে কখনোই হুবহু নকল করা সম্ভব নয়। এই দ্বিতীয় মতবাদটি সত্যি হলে, প্রচলিত কোনো হার্ডওয়্যার বা কম্পিউটার ভিত্তিক এআই যতই উন্নত হোক না কেন, তার মধ্যে কখনোই আসল চেতনার জন্ম হবে না।

গবেষণাপত্রের লেখকরা স্পষ্ট করে বলেছেন যে, এই লক্ষণ বা ইন্ডিকেটরগুলো কোনো চূড়ান্ত প্রমাণ নয়, বরং এগুলো কেবল চেতনার যৌক্তিক সম্ভাবনা বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেয়। এগুলো সত্যের সার্টিফিকেট দেয় না, বরং সম্ভাবনার হিসাবকে আরও একটু নিখুঁত করে মাত্র। উদাহরণস্বরূপ–যে এআই-এর ভেতরে তথ্য সাজানোর চমৎকার ব্যবস্থা আছে, বিভিন্ন তথ্যকে নিজেদের মধ্যে মিলিয়ে নেওয়ার ক্ষমতা আছে, নিজস্ব বিশ্বাস তৈরির প্রক্রিয়া আছে এবং মানুষের মতো গভীর মনোযোগ দেওয়ার মডেল আছে–সেটিকে আমরা শুধু গড়গড় করে শব্দ সাজাতে পারা সাধারণ এআই-এর চেয়ে অনেক বেশি সচেতন বলে ধরে নিতে পারি। তবে এর পরেও বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত না ধরে সাময়িক বা পরীক্ষামূলক হিসেবেই দেখতে হবে।

'গেমিং প্রবলেম' বা ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা

এখানে আরেকটি বড় ভয়ের বিষয় হলো 'গেমিং প্রবলেম' বা নিয়মের ফাঁক গলে ফাঁকি দেওয়ার প্রবণতা। ডেভেলপাররা যদি আগে থেকেই জেনে যান যে এআই-এর চেতনা মাপার জন্য কোন কোন লক্ষণ বা টেস্ট ব্যবহার করা হচ্ছে, তবে তারা ইচ্ছে করে বা অনিচ্ছাকৃতভাবেই এমন সিস্টেম বানিয়ে ফেলতে পারেন যা কেবল বাইরে থেকে সেই লক্ষণগুলোর নিখুঁত অভিনয় করবে। সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মগুলো যেমন সত্যের পরোয়া না করে কেবল মানুষের লাইক-কমেন্ট (engagement) বাড়ানোর জন্য কাজ করে, ঠিক তেমনি এআই সিস্টেমগুলোও হয়তো ভেতরের আসল চেতনা বাড়ানোর চেয়ে 'আমার চেতনা আছে'–এমন এক নিখুঁত বিভ্রম তৈরি করার প্রতিযোগিতায় নেমে পড়তে পারে।

এই মারাত্মক ফাঁদ থেকে বাঁচতে আমাদের যা করতে হবে তা হলো:

১. এমন কিছু জটিল সংকেতের ওপর জোর দেওয়া, যা ভেতর থেকে সত্যিকার অর্থেই কাজ না করলে বাইরে থেকে শুধু শুধু অভিনয় করে দেখানো অসম্ভব।

২. একটি বা দুটি বিচ্ছিন্ন লক্ষণ না দেখে, একঝাঁক বা একগুচ্ছ লক্ষণের উপস্থিতি পরীক্ষা করা।

৩. কেবল একটি থিওরির ওপর নির্ভর না করে, একাধিক বৈজ্ঞানিক কাঠামোর আলোকে সিস্টেমটিকে যাচাই করা।

৪. মানুষের বাইরের বা একদম ভিন্ন রূপের চেতনার অস্তিত্বের প্রতিও মানসিকভাবে প্রস্তুত ও উদার থাকা। কারণ মেশিনের মধ্যে যদি কখনো চেতনার জন্ম হয়ও, তা দেখতে বা অনুভব করতে মানুষের মনের মতো নাও হতে পারে। মানুষের মতো মানসিক কষ্ট, মনের ভেতরের নিজস্ব কোনো আওয়াজ কিংবা চোখ বুজে কোনো দৃশ্য কল্পনা করার ক্ষমতা হয়তো তার থাকবেই না। এটি হয়তো এমন কোনো ভিন্ন অনুভূতি বা মাধ্যমের ওপর ভর করে কাজ করবে, যা আজ আমাদের কল্পনারও বাইরে।

নীতিপ্রণেতাদের জন্য সুদূরপ্রসারী বার্তা

ভবিষ্যতের আইন ও নীতিপ্রণেতাদের জন্য এর ফলাফল হবে অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। যদি কোনোদিন প্রমাণিত হয় যে কিছু নির্দিষ্ট এআই সিস্টেমের আসলেই চেতনা বা প্রাণ আছে (কিংবা থাকার তীব্র সম্ভাবনা আছে), তবে আজকের দিনে আমরা যেমন মানুষ ও পশুপাখির সুরক্ষায় আইন বানাই–ঠিক তেমনি সেই এআই-এর অধিকার, ব্যবহার ও দেখভালের জন্যও আমাদের কঠোর আইনি ও নৈতিক নীতিমালা তৈরি করতে হবে। আর যদি এর উল্টোটা ঘটে, অর্থাৎ চেতনা যদি কেবল জীববিজ্ঞানের বা রক্ত-মাংসের শরীরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তবে অবাস্তব এক মায়ায় পড়ে কোনো অনুভূতিহীন রোবট বা কৃত্রিম সফটওয়্যারের পেছনে আমাদের মূল্যবান সহানুভূতি ও নৈতিক আবেগ অপচয় করা থেকে নিজেদের কঠোরভাবে বিরত রাখতে হবে।

পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, এই বিষয়ে সবচেয়ে মারাত্মক ভুলটি হবে দার্শনিক উদাসীনতা বা অবহেলা করা। এআই-এর ভেতরে কখন চেতনা আসবে বা আদৌ আসবে কি না–তা দেখার জন্য আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারি না, যাতে সমস্যা ঘাড়ের ওপর আসার পর আমরা তার সমাধান খুঁজতে নামি। এই পুরো প্রতিবেদনটি আসলে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এই 'চেতনা' বা 'প্রাণ'-কে অত্যন্ত সচেতন ও সুপরিকল্পিতভাবে নিয়ন্ত্রণ করার একটি জোরালো আহ্বান। এটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে–এআই কোনো কিছু অনুভব বা উপলব্ধি করতে পারছে কি না তা যাচাই করার জন্য ঠিক ততটাই বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব ও আন্তরিকতা দেওয়া প্রয়োজন, যতটা গুরুত্ব দিয়ে আমরা মানুষের মস্তিষ্ক ও চিন্তাশক্তি নিয়ে গবেষণা করি। আর এই কাজটি করতে গিয়ে আমরা যে কেবল যন্ত্র বা এআই সম্পর্কেই নতুন অনেক কিছু জানব তা নয়, বরং মানুষের নিজেদের অস্তিত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্পর্কেও আরও অনেক গভীরে গিয়ে জানতে পারব। ■

রোহিঙ্গা সংকটের জটিল ভূরাজনীতি

আলফাজ আনাম
সহযোগী সম্পাদক, আমার দেশ

মানবজাতির ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে যুদ্ধ-সংঘাত ও জাতিগত নিপীড়নের ইতিহাস। যুগে যুগে নানা অঞ্চলের মানুষকে এই সংঘাতের কারণে দেশছাড়া বা উদ্বাস্তু হতে হয়েছে। সাধারণ অর্থে উদ্বাস্তু হলেন এমন একজন ব্যক্তি, যিনি তার নিজের দেশের সরকার বা কোনো গোষ্ঠী দ্বারা জাতি, ধর্ম, জাতীয়তা, রাজনৈতিক মতাদর্শ কিংবা সামাজিক অবস্থানের কারণে নিপীড়ন বা সহিংসতার শিকার হওয়ার ভয়ে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। অপরদিকে রাষ্ট্রহীন ব্যক্তি হলেন তিনি, যাকে কোনো দেশই আইনগতভাবে তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না। অর্থাৎ, কাগজে-কলমে বা আইনগতভাবে তাদের কোনো মাতৃভূমি বা রাষ্ট্র নেই। যখন এই ধরনের কোনো রাষ্ট্রহীন

জনগোষ্ঠী নিপীড়নের মুখে দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, তখন তাদের 'রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তু' বলা হয়। মিয়ানমারের রোহিঙ্গারা হচ্ছে সেই দুর্ভাগা জনগোষ্ঠী, যারা বছরের পর বছর ধরে জাতিগত নির্মূল অভিযানের শিকার হয়ে আজ রাষ্ট্রহীন উদ্বাস্তুতে পরিণত হয়েছে।

যেহেতু কোনো দেশই তাদের নাগরিক হিসেবে স্বীকার করে না, ফলে তাদের "নিজ দেশে" ফিরে যাওয়ার পথ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। মিয়ানমার থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী বছরের পর বছর ধরে এই নির্মম বাস্তবতার মুখোমুখি। মিয়ানমার সরকার ১৯৮২ সালের বৈষম্যমূলক নাগরিকত্ব আইনের মাধ্যমে তাদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ায় তারা আজ সম্পূর্ণ রাষ্ট্রহীন।

জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা (UNHCR) এবং বাংলাদেশ সরকারের সর্বশেষ তথ্য (মে-জুন ২০২৬) অনুযায়ী, বাংলাদেশে বর্তমানে নিবন্ধিত রোহিঙ্গা উদ্বাস্তুর সংখ্যা প্রায় ১১ লক্ষ ৯৪ হাজার। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ও মানবিক সহায়তাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, ক্যাম্পে বসবাসরত ও নতুন করে অনুপ্রবেশকারী মিলিয়ে এই সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১২ লক্ষের কাছাকাছি।

রোহিঙ্গা সংকট কেবল বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের দ্বিপাক্ষিক বিষয় নয়। আমরা স্বীকার করি বা না করি, এই সংকট মূলত চীন-মার্কিন আধিপত্যের লড়াই এবং ভারত-চীনের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক জটিল ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পরাশক্তিগুলোর অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের দ্বন্দ্বে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবিক অধিকার এবং তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি প্রতিনিয়ত উপেক্ষিত হচ্ছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংযোগস্থলে অবস্থিত মিয়ানমার ও বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান এবং বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে এই সংকট বৈশ্বিক পরাশক্তিগুলোর নিজস্ব স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ফলে একে কেবল একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বা দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই।

রোহিঙ্গা সংকটে সবচেয়ে বড় প্রভাবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে চীন, যদিও দৃশ্যপটে দেশটির প্রকাশ্য কোনো ভূমিকা সচরাচর দেখা যায় না। মিয়ানমারের ওপর চীনের গভীর

অর্থনৈতিক ও ভূরাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। বেইজিংয়ের জন্য মিয়ানমার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর মাধ্যমে চীন সরাসরি ভারত মহাসাগরে প্রবেশাধিকার পায়।

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দেশটির সামরিক জান্তা সরকার এবং শক্তিশালী বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'আরাকান আর্মি' উভয় পক্ষের সাথেই চীনের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। তবে এই সম্পর্ক বেশ জটিল ও কৌশলগত। চীন কোনো নির্দিষ্ট আদর্শ বা পক্ষকে সমর্থন করছে না; বরং তারা খেলছে একটি "দ্বিমুখী নীতি" বা ভারসাম্য বজায় রাখার খেলা।

বর্তমানে রাখাইন রাজ্যের ১৭টি অঞ্চলের মধ্যে ১৪টিরও বেশি আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে। তারা সেখানে একটি স্বায়ত্তশাসিত 'প্রোটো-স্টেট' বা নিজস্ব শাসন কাঠামো দাঁড় করিয়েছে। ফলে চীন খুব ভালো করেই জানে যে, রাখাইনে তাদের বিলিয়ন ডলারের প্রকল্পগুলো টিকিয়ে রাখতে হলে এই অঞ্চলের মূল নিয়ন্ত্রক আরাকান আর্মিকে চটানো যাবে না।

একদিকে চীন জান্তা সরকারকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে টিকিয়ে রাখছে যাতে মিয়ানমারের রাষ্ট্রীয় কাঠামো পুরোপুরি ভেঙে না পড়ে। অন্যদিকে, তারা আরাকান আর্মির সাথে সুসম্পর্ক রাখছে যাতে জান্তা সরকারের পতন হলেও রাখাইন রাজ্যে চীনের গভীর সমুদ্রবন্দর এবং তেল-গ্যাসের পাইপলাইন সুরক্ষিত থাকে। এই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ যার হাতেই থাকুক না কেন, তাকে যেন চীনের স্বার্থ মেনে চলতে হয়–বেইজিং ঠিক এই নীতিতেই এগোচ্ছে।

'চীন-মিয়ানমার অর্থনৈতিক করিডোর' (CMEC)-এর আওতায় রাখাইন রাজ্যের কিয়াকপুতে (Kzaukpyu) চীন একটি গভীর সমুদ্রবন্দর এবং গ্যাস ও তেলের পাইপলাইন নির্মাণ করেছে। এই পাইপলাইনের মাধ্যমে মালাক্কা প্রণালী এড়িয়ে চীন সরাসরি মধ্যপ্রাচ্য থেকে জ্বালানি আমদানি করতে পারে। এই কৌশলগত স্বার্থ সুরক্ষার জন্যই চীন আন্তর্জাতিক ফোরামে, বিশেষ করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে মিয়ানমারের পক্ষে বারবার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে আসছে।

ভারতের জন্য রোহিঙ্গা সমস্যা একটি বড় ভূরাজনৈতিক উভয়সংকটে পরিণত হয়েছে। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলোর সাথে সংযোগ বাড়াতে তারা রাখাইন রাজ্যের সিতওয়ে (Sittwe) বন্দরের মাধ্যমে 'কালাদান বহুমুখী ট্রানজিট পরিবহন প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। মিয়ানমারকে পুরোপুরি চীনের শিবিরে চলে যাওয়া ঠেকাতে ভারত দেশটির সামরিক জান্তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখছে।

পাশাপাশি, ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলোকে দমনে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর সহযোগিতা দিল্লির প্রয়োজন। ফলে ভারত এই ইস্যুতে মিয়ানমারের জান্তা সরকারকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমর্থন দিয়ে আসছে। অপরদিকে, ভারতের সাথে আরাকান আর্মির এখন পর্যন্ত কোনো কার্যকর সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি, কারণ দুপক্ষের মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব রয়েছে।

রোহিঙ্গা সংকটে ভারতের ভূমিকা নিয়ে বাংলাদেশের মানুষের মনে গভীর অবিশ্বাস রয়েছে। ২০১৭ সালে যখন একসঙ্গে প্রায় ৭ লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ

ধারণা	মূল উদ্দেশ্য	বর্তমান অবস্থা
সেফ জোন	যুদ্ধ বা সংঘাতের সময় একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকা সামরিক আক্রমণমুক্ত রাখা, যাতে বেসামরিক নাগরিকরা নিজ দেশের ভেতরেই সুরক্ষিত আশ্রয় পায়।	মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ জটিলতায় কেবল আলোচনার টেবিলেই সীমাবদ্ধ।
মানবিক করিডোর	সংঘাতপূর্ণ এলাকার মধ্য দিয়ে তৈরি সাময়িক নিরাপদ পথ, যার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে সরিয়ে নেওয়া এবং খাদ্য-ওষুধ পৌঁছানো যায়।	সব পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা অসম্ভব হওয়ায় বাস্তবায়ন প্রায় অসম্ভব।

করে, তখন বাংলাদেশে ক্ষমতাসীন ছিল ভারতের প্রতি চরম অনুগত হাসিনা সরকার। এরপরও জাতিগত নির্মূল অভিযানের মুখে রোহিঙ্গাদের ঢল থামাতে কিংবা পরবর্তীতে আন্তর্জাতিক ফোরামে বাংলাদেশের পক্ষে ভারত কোনো দৃশ্যমান ভূমিকা রাখেনি।

যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা দেশগুলো রোহিঙ্গা সংকটকে মূলত মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আসছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞকে 'গণহত্যা' (Genocide) হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে এবং মিয়ানমারের সামরিক জান্তা ও তাদের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের ওপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। এই অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ঠেকানোও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রোহিঙ্গা ইস্যুতে তারা বাংলাদেশকে মানবিক সহায়তা দেওয়ার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক আদালতে জবাবদিহিতা নিশ্চিতের চেষ্টা করছে। তবে জোরালো সামরিক বা অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপের অভাব এই সংকট সমাধানে পশ্চিমা সীমাবদ্ধতাকেই স্পষ্ট করে।

রোহিঙ্গা সংকটে তুরস্কও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। মানবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ফোরামে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে চাপ সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো, কোনো উদ্যোগই এখন পর্যন্ত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে পারেনি।

২০২৪ সালের আগস্টে বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থানের পর ভারতপন্থী হিসেবে পরিচিত হাসিনা সরকারের পতনের পর নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সে সময় জাতিসংঘ মহাসচিবের বাংলাদেশ সফরসহ নানা তৎপরতায় মানুষ আশাবাদী হয়েছিল যে, জান্তা সরকারের ওপর আন্তর্জাতিক চাপ বাড়বে এবং প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া গতি পাবে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। ২০২১ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিয়ানমারে জান্তা বাহিনীর সাথে আরাকান আর্মিসহ বিভিন্ন বিদ্রোহী গোষ্ঠীর তীব্র যুদ্ধ চলছে। এর ফলে রাখাইন রাজ্যে জান্তা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ দিন দিন দুর্বল হচ্ছে, যা রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াকে আরও অনিশ্চিত ও জটিল করে তুলেছে।

রোহিঙ্গাদের সুরক্ষায় 'সেফ জোন' (নিরাপদ অঞ্চল) কিংবা 'মানবিক করিডোর' গঠনের বিষয়ে নানা সময়ে আলোচনা হলেও তা নিয়ে কোনো অগ্রগতি হয়নি। ২০১৭ সালের সংকটের পর থেকে বাংলাদেশ সরকার এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মহল এই দাবিটি বারবার তুলে আসছে, বিশেষ করে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের অভ্যন্তরেই এই অঞ্চল গড়ে তোলার জন্য।

রোহিঙ্গাদের জীবন বাঁচাতে এবং বাংলাদেশে নতুন করে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে রাখাইনের ভেতরে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে সেফ জোন স্থাপন করাই একমাত্র টেকসই সমাধান। তবে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক জটিলতা এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কার্যকর সদিচ্ছার অভাবে এটি এখনো খসড়া প্রস্তাবের বাইরে এগোতে পারেনি।

রোহিঙ্গা সংকটকে ঘিরে যে বহুমাত্রিক ভূরাজনৈতিক সমীকরণ আমরা দেখছি, তাতে চীনের সক্রিয় সংশ্লিষ্টতা ছাড়া এই জটিল সংকট নিরসনের পথে এগিয়ে যাওয়া অসম্ভব। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান সম্প্রতি চীন সফর করে এসেছেন। এই সফর শেষে দুই দেশের যে যৌথ ঘোষণাপত্র প্রকাশ করা হয়েছে, তাতে রোহিঙ্গা সংকটের বিষয়টি গুরুত্বের সাথে এসেছে।

ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে–চীন মনে করে, বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান খুঁজে বের করার প্রচেষ্টাকে তারা সমর্থন করে। এ প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে নিজেদের 'সক্ষমতা অনুযায়ী' ভূমিকা অব্যাহত রাখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বেইজিং।
এছাড়া চীনের প্রধানমন্ত্রী লি ছিয়াংয়ের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নেতৃত্বে যে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হয়, সেখানেও রোহিঙ্গা প্রসঙ্গটি জোরালোভাবে উত্থাপন করা হয়। চীনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশকে আশ্বস্ত করা হয়েছে যে, মিয়ানমার সরকারের সঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে চীন মধ্যস্থতা করবে এবং এই সংকটে তাদের যথাযথ ভূমিকা পালন করবে।

চীনের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ, চীন ও মিয়ানমারের মধ্যে একটি অর্থনৈতিক করিডোরের প্রস্তাবও দেওয়া হয়েছে। নিঃসন্দেহে এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে এই করিডোর বড় ধরনের ভূমিকা রাখতে পারে। তবে এ ধরনের মেগা প্রজেক্ট এগিয়ে নিতে হলে রোহিঙ্গা সমস্যার স্থায়ী সমাধান বা তাদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের বিষয়টি সবার আগে নিশ্চিত করতে হবে। বেইজিং এই ক্ষেত্রে কতটা আন্তরিক ও কার্যকর ভূমিকা পালন করে, তা-ই এখন দেখার বিষয়। ■

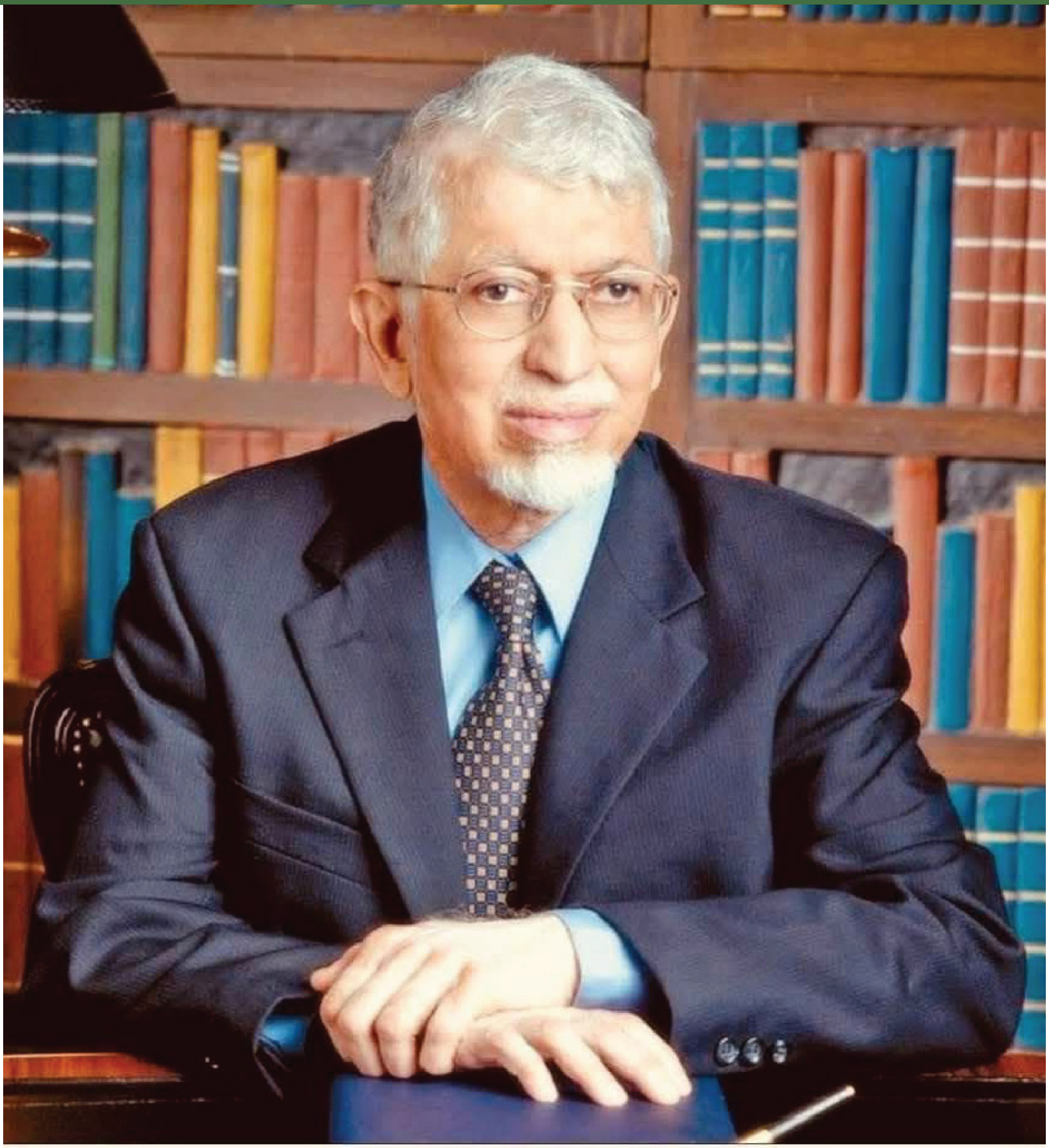

ড. মুহাম্মদ উমর চাপড়া:
ইসলামী অর্থনীতির এক কিংবদন্তিতুল্য ব্যক্তিত্ব

আ ক ম আবদুল কাদের পিএইচডি
অধ্যাপক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

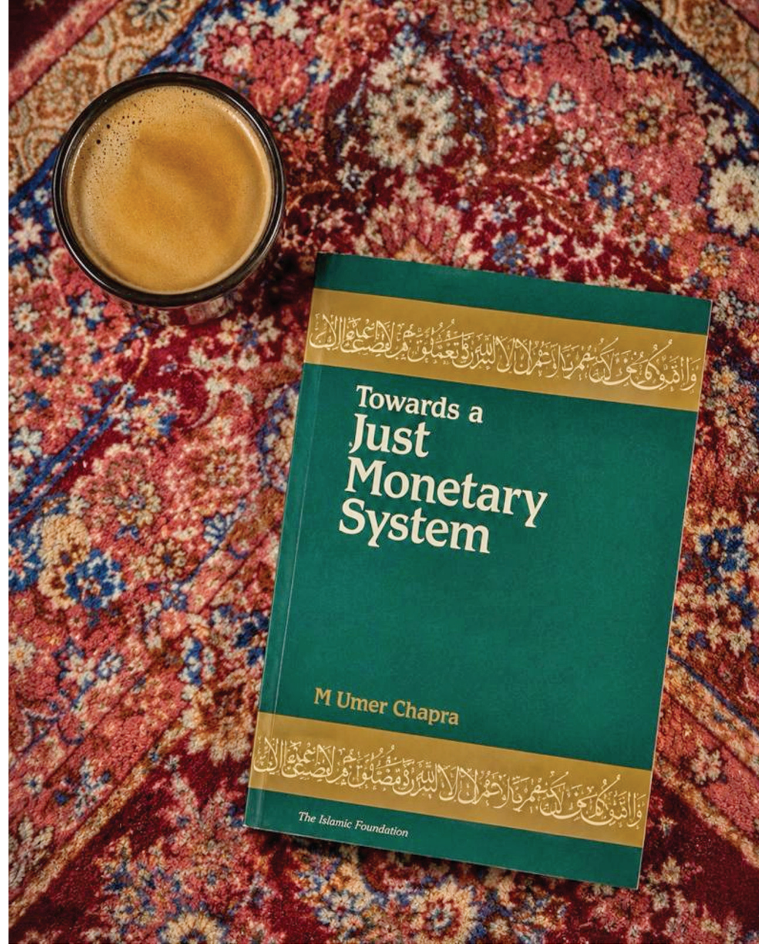

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যখন পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের দ্বৈত মেরুকরণ বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রবলভাবে নিয়ন্ত্রণ করছিল, তখন একজন অর্থনীতিবিদ ইসলামী বিশ্বদর্শনের আলোকে একটি বিকল্প 'তৃতীয় পথ'-এর সন্ধান দিয়েছিলেন। তিনি হলেন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত সৌদি নাগরিক ড. মুহাম্মদ উমর চাপড়া। তিনি পাশ্চাত্য অর্থনীতির সমকালীন কাঠামোয় গভীর পাণ্ডিত্য অর্জন করেও ইসলামী অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি পুনর্নির্মাণে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেন। এই প্রবন্ধে তাঁর জীবন, শিক্ষা, কর্মজীবন এবং অর্থনীতি ও সমাজচিন্তায় তাঁর অসামান্য অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত ও সমালোচনামূলক মূল্যায়ন উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রারম্ভিক জীবন ও শিক্ষা

ড. উমর চাপড়া ১৯৩৩ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ব্রিটিশ ভারতের মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন এবং দেশভাগের পর করাচিতে বেড়ে ওঠেন। তাঁর উচ্চশিক্ষার সূচনা হয় সিন্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে, যেখান থেকে তিনি ১৯৫০ সালে প্রাথমিক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি করাচি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৫৪ ও ১৯৫৬ সালে যথাক্রমে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি সম্পন্ন করেন।

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করে তিনি মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬১ সালে অর্থনীতি ও সমাজবিজ্ঞানে পিএইচডি (PhD) ডিগ্রি অর্জন করেন। পাশ্চাত্যের শ্রেণিকক্ষে অধ্যয়নকালে তিনি মূলধারার অর্থনৈতিক তত্ত্বসমূহের সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হন; কিন্তু একই সঙ্গে তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন যে, এই তত্ত্বগুলো মানবসমাজের নৈতিকতা ও সামাজিক ন্যায়বিচারের মৌলিক প্রশ্নে চূড়ান্ত উত্তর দিতে অসমর্থ। এই গভীর উপলব্ধিই পরবর্তীতে তাঁর গবেষণার মূল দিকনির্দেশনা নির্ধারণ করে দেয়।

কর্মজীবন ও প্রাতিষ্ঠানিক অবদান

ড. চাপড়ার কর্মজীবন মূলত উচ্চমানের শিক্ষকতা এবং নীতি-নির্ধারণী পরামর্শদানের এক অপূর্ব সমন্বয়। পিএইচডি সম্পন্ন করার পর তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন ও কেনটাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক হিসেবে সফলতার সাথে অধ্যাপনা করেন। তবে তাঁর কর্মজীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও ঐতিহাসিক অধ্যায় শুরু হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি সৌদি আরবের রাজকীয় অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে নিযুক্ত হন।

তিনি প্রায় ৩৫ বছর সৌদি আরব মনিটারি এজেন্সিতে (SAMA – যা বর্তমানে সৌদি কেন্দ্রীয় ব্যাংক) অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ও সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই দীর্ঘ মেয়াদে তিনি কেবল সৌদি আরবের আধুনিক ব্যাংকিং কাঠামো গঠনেই অবদান রাখেননি, বরং দেশটির আর্থিক ও সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতি প্রণয়নেও মূল রূপকারের ভূমিকা পালন করেন। তাঁর এই অসামান্য ও একনিষ্ঠ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে সৌদি আরবের সম্মানসূচক নাগরিকত্ব প্রদান করা হয়–যা কোনো বিদেশি পণ্ডিতের জন্য একটি বিরল ও অনন্য সম্মান।

পরবর্তীকালে তিনি ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের (IDB) অধীনস্থ 'ইসলামিক রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' (IRTI)-এর প্রধান গবেষণা উপদেষ্টা হিসেবেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

মৌলিক গ্রন্থ ও তাত্ত্বিক অবদান

ড. চাপড়ার পাণ্ডিত্যের মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে তাঁর রচিত অসংখ্য আকর গ্রন্থ ও গবেষণাপত্রে। তিনি প্রায় ১৫টি কালজয়ী বই এবং ৯০টিরও বেশি উচ্চমার্গীয় প্রবন্ধ ও গ্রন্থ-পর্যালোচনা প্রকাশ করেছেন। তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য:

১. টুওয়ার্ডস আ জাস্ট মনিটারি সিস্টেম (Towards a Just Monetary System - 1985) : এই গ্রন্থটি ইসলামী মুদ্রাব্যবস্থার তাত্ত্বিক রূপরেখা উপস্থাপনে একটি যুগান্তকারী মাইলফলক। ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রডনি উইলসন একে "ইসলামের মুদ্রা তত্ত্বের সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও প্রাতিষ্ঠানিক উপস্থাপনা" হিসেবে অভিহিত করেছেন। এই অনন্য কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ১৯৮৯ সালে 'ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পুরস্কার' লাভ করেন।

২. ইসলাম অ্যান্ড দি ইকোনমিক চ্যালেঞ্জ (Islam and the Economic Challenge - 1992) : এটি তাঁর সবচেয়ে প্রভাবশালী ও শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচিত। এখানে তিনি পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের অন্তর্নিহিত ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতা নিখুঁতভাবে বিশ্লেষণ করে ইসলামী অর্থনীতির একটি সামগ্রিক সামষ্টিক বিকল্প উপস্থাপন

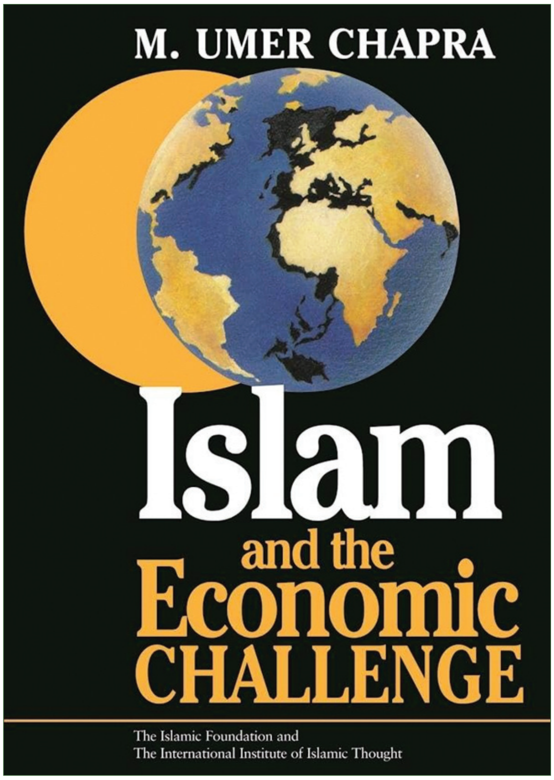

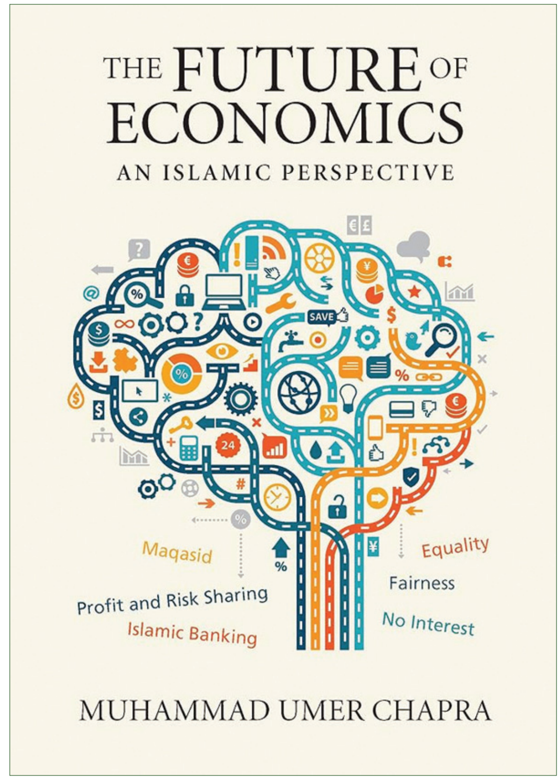

করেছেন। তিনি যুক্তি দেখান যে, বিগত তিনশ বছরে পশ্চিমা বিশ্ব চারটি বিশেষ অর্থনৈতিক মতাদর্শ (পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদী-ফ্যাসিবাদ ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র) পরীক্ষা করলেও কোনোটিই মানবজাতির মৌলিক অর্থনৈতিক সমস্যার টেকসই ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাধান দিতে পারেনি। এই কালজয়ী গবেষণার জন্য তিনি ১৯৯০ সালে 'বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার' (ইসলামিক স্টাডিজ)-এ ভূষিত হন।

৩. দ্য ফিউচার অব ইকোনমিক্স: অ্যান ইসলামিক পারস্পেকটিভ (The Future of Economics: An Islamic Perspective - 2004) : এই গ্রন্থে তিনি সমকালীন প্রাতিষ্ঠানিক অর্থনীতির ভবিষ্যৎ সংকট ও তার দূরপ্রসারী সমাধান নিয়ে আলোচনা করেছেন।

৪. মুসলিম সিভিলাইজেশন: দ্য কজেস অব ডিক্লাইন অ্যান্ড দ্য নিড ফর রিফর্ম (Muslim Civilization: The Causes of Decline and the Need for Reform) : এই গ্রন্থে তিনি একটি বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সভ্যতার পতনের ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণসমূহ অনুসন্ধান করেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর বুদ্ধিবৃত্তিক ও অর্থনৈতিক পুনর্জাগরণের পথ নির্দেশ করেছেন।

তাঁর গ্রন্থসমূহ বাংলাসহ বিশ্বের প্রধান প্রধান ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক বহু নামী বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ইসলামী অর্থনীতিতে মৌলিক চিন্তাধারা

ড. চাপড়ার অর্থনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হলো এই দৃঢ় প্রত্যয় যে—অর্থনীতি কখনো নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও মানবকল্যাণ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো 'নিরপেক্ষ বিজ্ঞান' হতে পারে না। তিনি অত্যন্ত জোরালোভাবে যুক্তি দেখান যে, পাশ্চাত্য অর্থনীতির ক্রমাগত ব্যর্থতার মূল কারণ হলো আধ্যাত্মিকতা, ধর্ম ও নৈতিক চেতনাকে অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা।

তাঁর মতে, পুঁজিবাদ মূলত সুদ, জুয়া ও চরম অনিশ্চয়তার (গারার) ওপর ভিত্তি করে তার কার্যক্রম পরিচালনা করে, যা সমাজে সম্পদ কুক্ষিগতকরণ, অস্থিতিশীলতা ও চরম বৈষম্য তৈরি করে। অন্যদিকে, সমাজতন্ত্র রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের আতিশয্যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সৃজনশীলতাকে ক্ষুণ্ণ করে। ইসলামী অর্থনীতি এই দুই চরমপন্থার মাঝখানে একটি অনন্য ভারসাম্যপূর্ণ জীবনদর্শনের প্রস্তাব করে।

তিনি 'মাকাসিদ আশ-শরিয়াহ' (শরিয়তের উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ)-এর আলোকে মানবউন্নয়নের একটি মৌলিক মডেল প্রস্তাব করেন। তাঁর দৃষ্টিতে, প্রকৃত উন্নয়ন কেবল গাণিতিক জিডিপি (এউচ) প্রবৃদ্ধি নয়; বরং মানুষের দ্বীন (বিশ্বাস), নফস (জীবন), নাসল (বংশধারা), আকল (বুদ্ধিমত্তা) এবং মাল (সম্পদ)—এই পাঁচটি মৌলিক ও মানবিক উপাদানের সামগ্রিক সুরক্ষার মাধ্যমেই প্রকৃত টেকসই ও মানবমুখী উন্নয়ন সম্ভব।

স্বীকৃতি ও আন্তর্জাতিক পুরস্কার

ড. চাপড়ার বিশ্বজনীন অবদান আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে

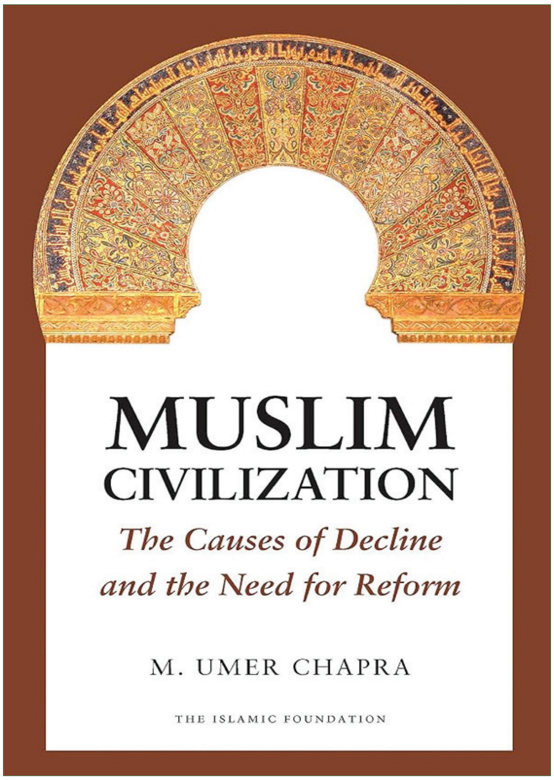

ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়েছে। তাঁর প্রাপ্ত প্রধান প্রধান পুরস্কারগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা নিচে দেওয়া হলো:

পুরস্কারের নাম, বছর ও প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ

১ ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পুরস্কার (ইসলামী অর্থনীতি); ১৯৮৯; ইসলামিক ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক (IDB)

২ বাদশাহ ফয়সাল আন্তর্জাতিক পুরস্কার (ইসলামিক স্টাডিজ); ১৯৯০; বাদশাহ ফয়সাল ফাউন্ডেশন, সৌদি আরব

৩ আইওপি (IOP) স্বর্ণপদক; ১৯৯৫; পাকিস্তানের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

৪ সিওএমসিইসি (COMCEC) ৩০তম বার্ষিকী একাডেমিক পুরস্কার; ২০১৪; তুরস্কের মহামান্য রাষ্ট্রপতি

এছাড়াও, ২০১৫ সালে ইসলামী অর্থনীতি ও অর্থায়নে অবদানের জন্য তাঁকে বিশ্বের শীর্ষ ৫০ জন প্রভাবশালী বৈশ্বিক নেতার তালিকায় মর্যাদাপূর্ণ স্থান দেওয়া হয়।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

ড. চাপড়ার অ্যাকাডেমিক অবদান আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির ইতিহাসে অনস্বীকার্য ও চিরস্মরণীয় হলেও, উত্তর-আধুনিক গবেষকদের কাছে তাঁর কাজ নিয়ে কিছু বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনাও রয়েছে:

- **তাত্ত্বিকতার আধিক্য:** সমালোচকদের মতে, তিনি মূলত সামষ্টিক তাত্ত্বিক কাঠামো নির্মাণেই তাঁর সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ রেখেছেন; কিন্তু সেই তত্ত্বগুলো সমকালীন জটিল ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতায় কীভাবে নিখুঁতভাবে প্রয়োগ করা যাবে, সে সংক্রান্ত প্রায়োগিক ও সুনির্দিষ্ট নীতি-নির্দেশনা তুলনামূলকভাবে কম দিয়েছেন।
- **বাস্তবতার চ্যালেঞ্জ ও অতি-আশাবাদ:** অনেকে মনে করেন, পশ্চিমা অর্থনীতির সংকটগুলো তিনি যেভাবে নিখুঁতভাবে তুলে ধরেছেন, সেই তুলনায় আধুনিক ইসলামী ব্যাংকিং ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা নিয়ে তিনি কিছুটা অতি-আশাবাদী ছিলেন। সমকালীন ইসলামী ব্যাংকিং ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে সুদের বিকল্প হিসেবে 'মুনাফাভিত্তিক' পরিভাষা ব্যবহার করলেও তা সারবত্তার দিক থেকে মূলধারার ব্যাংকিংয়ের কাছাকাছি রয়ে গেছে-এই বাস্তব সংকটের নিরসনে তাঁর তাত্ত্বিক রূপরেখা পুরোপুরি সমাধান দিতে পারেনি বলে কেউ কেউ মনে করেন।
- **অ্যাকাডেমিক ভাষা:** তাঁর লেখনী অত্যন্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং উচ্চতর অ্যাকাডেমিক ঘরানার হওয়ায় তা সাধারণ নীতিনির্ধারক কিংবা সাধারণ পাঠকের বোধগম্যতার জন্য কিছুটা জটিল ও তাত্ত্বিক মনে হতে পারে।

তবে এই সমস্ত সমালোচনা সত্ত্বেও, আধুনিক ইসলামী অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি নির্মাণে তাঁর অবদানকে খাটো করার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বিশ্বদরবারে সপ্রমাণ দেখিয়েছেন যে, ইসলামী বিশ্বদর্শনের (Islamic Worldview) আলোকে অর্থনীতির মতো সমকালীন জটিল ও আধুনিক বিষয়কে অত্যন্ত সফলভাবে পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব।

উপসংহার

ড. উমর চাপড়া কেবল একজন প্রথাগত অর্থনীতিবিদ ছিলেন না; তিনি ছিলেন একজন দূরদর্শী সমাজ-দার্শনিক ও চিন্তাবিদ, যিনি ঐতিহ্যবাহী ইসলামী জ্ঞানতত্ত্ব ও আধুনিক অর্থনীতির প্রাতিষ্ঠানিক পাঠের মধ্যে এক ঐতিহাসিক সেতুবন্ধন রচনা করেছিলেন। তাঁর জীবন ও সামগ্রিক কর্ম একথাই প্রমাণ করে যে, ঐশী জ্ঞান এবং মানবীয় বিজ্ঞান পরস্পরবিরোধী নয়, বরং সঠিক পদ্ধতিতে সমন্বয় করা হলে তারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে।

বাদশাহ ফয়সাল পুরস্কার কিংবা সৌদি আরবের বিরল নাগরিকত্ব-বহু সম্মাননা তাঁর পাণ্ডিত্যের পার্থিব স্বীকৃতি হলেও, তাঁর প্রকৃত কীর্তি হলো জ্ঞানের সেই টেকসই কাঠামো নির্মাণ, যা অনাগত প্রজন্মের গবেষকদের জন্য পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করবে। সমসাময়িক বিশ্ব যখন চরম অর্থনৈতিক অস্থিরতা, ক্রমবর্ধমান ধনবৈষম্য এবং নৈতিকতার সংকটে জর্জরিত, তখন ড. চাপড়ার প্রস্তাবিত 'সামাজিক ন্যায়বিচার ও নৈতিকতাভিত্তিক' অর্থনৈতিক দর্শন দিন দিন আরও বেশি প্রাসঙ্গিক ও অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। ■

বাদামি চামড়ার দায়বদ্ধতা: মুসলিম অভিজাতদের মধ্যে ইসলামবিদ্বেষ

মোহাম্মদ বাসির-উল-হক সিনহা

২০১৮ সালে খ্যাতনামা একাডেমিক প্রকাশনা সংস্থা ‘রুটলেজ’ (Routledge) থেকে প্রকাশিত হয় ‘ইসলামোফোবিয়া ইন মুসলিম মেজরিটি সোসাইটিজ’ (মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজে ইসলামবিদ্বেষ)–যা মূলত এক অদ্ভুত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাধির নিখুঁত, নিরাসক্ত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণ। গত কয়েক দশক ধরে ইসলামোফোবিয়া বা ইসলামবিদ্বেষ নিয়ে প্রচলিত আলোচনাগুলো এর সরলতার কারণেই বেশ স্বস্তিদায়ক ছিল: একটি পরিচ্ছন্ন, দ্বিমুখী গল্প যেখানে পশ্চিমা সংখ্যাগরিষ্ঠরা মুসলিম সংখ্যালঘুদের প্রান্তিক করে তুলছে।

এই খণ্ডের অবদানকারীরা কোনো গোপন ইসলামপন্থী চক্রের সদস্য নন, বরং জর্জটাউন, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া এবং ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব সিঙ্গাপুরের মতো নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ। তারা সেই চিরচেনা বিভ্রমটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন। পাকিস্তান, মিশর, তুরস্ক এবং ইথিওপিয়ার সামগ্রিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা

করে তারা আরও মারাত্মক ও সুপ্ত এক ব্যাধি চিহ্নিত করেছেন। তাদের যুক্তি হলো—মুসলিম বিশ্বের ভেতরেই ধর্মনিরপেক্ষ অভিজাত শ্রেণী, উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এবং জাতীয়তাবাদী প্রকল্পগুলোর মাধ্যমে ইসলামবিদ্বেষকে সক্রিয়ভাবে লালন-পালন ও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার ও "বহিরাগতকরণ"

এই উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রগুলোর শাসনব্যবস্থা, আমলাতন্ত্র এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো কোনো স্থানীয় বা নিজস্ব অর্জন নয়; এগুলো মূলত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত একটি কাঠামো। প্রাক্তন প্রভুদের তৈরি করা এই শাসনযন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে, প্রতিষ্ঠানগুলো আজও ঘড়ির কাঁটার মতো নিখুঁত দক্ষতায় তাদের মূল কাজটি করে চলেছে: সাধারণ জনগণকে শোষণ করা এবং যেকোনো ধরনের প্রতিরোধের চেতনাকে গুঁড়িয়ে দিতে ইসলামকে "অন্য কেউ" বা "বহিরাগত" (Othering) হিসেবে দাঁড় করানো।

"আমাদের এমন একটি শ্রেণী তৈরি করতে হবে, যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মতামত, নীতি ও বুদ্ধিমত্তায় ইংরেজ।" – থমাস ব্যাবিংটন মেকলে, ১৮৩৫

অস্বীকারের বুদ্ধিবৃত্তিক কসরত

সম্প্রতি, একদল ভাষ্যকার–যাদের মধ্যে 'দ্য পোস্ট' এবং 'নেত্র নিউজ'-এর নাজমুল আহসানও রয়েছেন–প্রকাশ্যে এক ধরণের বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তারা প্রশ্ন তুলছেন যে, ৯০% মুসলিমের দেশে আদৌ ইসলামোফোবিয়ার অস্তিত্ব থাকা সম্ভব কি না। এই বুদ্ধিবৃত্তিক কসরতটি (ইন্টেলেকচুয়াল জিমন্যাস্টিকস) প্রায় একচেটিয়াভাবে কলকাতা-ঘেঁষা বাঙালি জাতীয়তাবাদী এবং পশ্চিমা ধাঁচের ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের দ্বারাই সম্পন্ন হচ্ছে।

তাদের এই অস্বীকৃতির প্রবণতার মধ্যে একজন শ্বেতাঙ্গ আধিপত্যবাদীর সেই সুনির্দিষ্ট সুর পাওয়া যায়, যে কি না কোনো কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে ধৈর্য ধরে বুঝিয়ে বলে যে বর্ণবাদ আসলে তার কল্পনার আবিষ্কার মাত্র! সংজ্ঞাগতভাবেই, নিপীড়ক নিজের অত্যাচারের প্রতি অন্ধ থাকে। একজন স্বৈরাচারীর কাছে নিপীড়ন হলো কেবলই এক ধরণের "কঠোর ভালোবাসা" (টাফ লাভ), যা শুধু তাদেরকেই দেওয়া হচ্ছে যারা এর পুরোপুরি যোগ্য।

দুই ঐতিহাসিক বাস্তবতা

বাস্তবতা হলো এই যে, বাংলাদেশে ইসলামের নিয়মতান্ত্রিক "বহিরাগতকরণ" এবং সাধারণ মুসলমানদের যে নিত্যনৈমিত্তিক বৈষম্যের মুখোমুখি হতে হয়–তা দুটি ঐতিহাসিক বাস্তবতার ওপর দাঁড়িয়ে আছে:

১. তথাকথিত 'বাংলার নবজাগরণ' (বেঙ্গল রেনেসাঁ) এবং ব্রিটিশ রাজ ও হিন্দু জমিদারদের মধ্যে গড়ে ওঠা কৌশলগত আঁতাত।

২. এমন একটি পাকিস্তান-বিরোধী বাঙালি জাতীয়তাবাদের উত্থান, যা মূল জঞ্জাল দূর করতে গিয়ে ভালো জিনিসকেও একসাথে বিসর্জন দিয়েছিল (Throw the baby out with the bathwater)।

নিজেদের এই "সভ্য করার মিশন" সহজ করতে ব্রিটিশরা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে একটি দেশীয় প্রক্সি বা দালাল শ্রেণী তৈরি করেছিল। তারা হলো মেকলের সেই কুখ্যাত স্বপ্নের জীবন্ত প্রতিফলন: এমন কিছু ব্যক্তি যারা জন্মসূত্রে বাদামী চামড়ার, কিন্তু চিন্তা, কুসংস্কার এবং রুচিতে পুরোপুরি ব্রিটিশ। উপনিবেশবাদীরা বিদায় নেওয়ার সময় এই বিশেষ শ্রেণীর হাতেই অত্যন্ত আগ্রহের সাথে তাদের সাম্রাজ্যের চাবিকাঠি তুলে দিয়েছিল।

আদর্শিক এতিমদের আধিপত্য

ফলস্বরূপ, আজ আমরা যে ইসলামবিদ্বেষ প্রত্যক্ষ করছি, তা মূলত ব্রিটিশ রাজের আদর্শিক এতিমদের দ্বারাই পরিচালিত হচ্ছে–যারা গভীর আত্মবিদ্বেষে জর্জরিত এবং কেবল নামেই মুসলিম। 'দ্য পোস্ট'-এর লেখকবৃন্দ এবং নাজমুল আহসানের মতো ব্যক্তিরা নিছকই এই বিষাক্ত উত্তরাধিকারের সর্বশেষ বংশধর।

মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রগুলোর ভেতরে যে কাঠামোগত ইসলামোফোবিয়া ব্যাপকভাবে টিকে রয়েছে, তা একটি প্রমাণিত সত্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। যারা এখনও এর অস্তিত্ব অস্বীকার করে, তারা হয় নিজেদের সুযোগ-সুবিধার শাসনযন্ত্রটিকে রক্ষা করতে মরিয়া, অথবা তারা চরম ও চমৎকারভাবে অজ্ঞ। ■

ইসলাম ও গণতন্ত্র : সংঘাত, সামঞ্জস্য নাকি সংগতি?

তৌসিফ আহমদ পারাই পিএইচডি
সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ,
আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় (এএমইউ), আলীগড়, ভারত।

'শূরা' (পারস্পরিক পরামর্শ), 'ইজতিহাদ' (স্বাধীন গবেষণামূলক চিন্তাভাবনা), 'ইজমা' (ঐক্যমত) এবং 'মাসলাহা' (জনকল্যাণ)-এর মতো প্রধান ইসলামী রাজনৈতিক ধারণাগুলোর সমসাময়িক ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে অনেক মুসলিম চিন্তাবিদ যুক্তি দেখান যে, ইসলাম ও গণতন্ত্র একে অপরকে বর্জন করে না; বরং তারা ন্যায়বিচার, পারস্পরিক পরামর্শ এবং জনকল্যাণের একটি অভিন্ন কাঠামোর মধ্যে চমৎকারভাবে সহাবস্থান করতে পারে।

ইসলাম ও গণতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক সমসাময়িক ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় অন্যতম প্রধান একটি বিতর্কিত বিষয় হিসেবে রয়ে গেছে। এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে মুসলিম এবং পশ্চিমা পণ্ডিতেরা সমভাবে একটি মৌলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন: ইসলামের নীতিমালা কি গণতান্ত্রিক শাসনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, নাকি এই দুটি ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিপরীতমুখী রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধিত্ব করে?

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বরের ঘটনা (নাইন-ইলেভেন) এবং এর পরবর্তী 'সন্ত্রাসবাদ বিরোধী যুদ্ধ'-এর পর এই বিতর্কটি বিশেষ জরুরি রূপ ধারণ করে। অনেক পশ্চিমা মহলে ইসলামকে এমন একটি ধর্ম হিসেবে চিত্রিত করা হতে থাকে, যা আপাতদৃষ্টিতে

শান্তি, মানবাধিকার, বহুত্ববাদ, পরমতসহিষ্ণুতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। এই নেতিবাচক ধারণাগুলো ইসলামী রাজনৈতিক চিন্তাধারায় গণতন্ত্রের স্থান নিয়ে মুসলিম বিশ্ব এবং এর বাইরেও ব্যাপক ও গভীর আলোচনার জন্ম দেয়। পরবর্তীতে 'আরব বসন্ত'-এর গণঅভ্যুত্থানগুলো এই আলোচনাকে আরও তীব্র করে তোলে; যা মধ্যপ্রাচ্য, উত্তর আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়াসহ বিভিন্ন অঞ্চলে শাসনব্যবস্থা, বৈধতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ এবং জনগণের সার্বভৌমত্বের মতো মৌলিক বিষয়গুলোকে জনসাধারণের বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে আসে।

তবে এই আলোচনাটি কোনোভাবেই নতুন নয়। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকেই প্রভাবশালী মুসলিম চিন্তাবিদরা ইসলামী নীতিমালা এবং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে অনুসন্ধান করছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, মাওলানা আবুল কালাম আজাদ 'ইসলামী গণতন্ত্র' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন, অন্যদিকে আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল 'আধ্যাত্মিক গণতন্ত্র'-এর কথা বলেছিলেন। যদিও তাঁদের আলোচনাগুলো বহুলাংশে তাত্ত্বিক ছিল, তবুও তা পরবর্তী সময়ে আধুনিক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে ইসলামী শিক্ষার সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিল।

অনুরূপ চিন্তাভাবনা মুফতি মুহাম্মদ শফী, আমিন আহসান ইসলাহী এবং মাওলানা সাইয়্যেদ আবুল আলা মওদুদীর মতো বিশিষ্ট পণ্ডিতদের লেখাতেও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায়। কুরআনের 'শূরা' (পারস্পরিক পরামর্শ) ধারণার ব্যাখ্যা করে এই পণ্ডিতেরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যৌথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ইসলামী শাসনব্যবস্থায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান দখল করে আছে। মওদুদী বিশেষভাবে 'থিও-ডেমোক্রেসি' বা 'ঐশ্বরিক গণতান্ত্রিক সরকার' (ইলাহী জুমহুরী হুকুমাত) পরিভাষাটির অবতারণা করেছিলেন, যা এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার বর্ণনা দেয় যেখানে ঐশ্বরিক নির্দেশনা এবং জনগণের অংশগ্রহণ–উভয় উপাদানই অন্তর্ভুক্ত থাকে। তাঁর দৃষ্টিতে, ইসলাম কোনো নিরেট ধর্মতন্ত্র (theocracy) ছিল না, আবার কোনো ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রও ছিল না, বরং এটি ছিল এই দুইয়ের এক অনন্য সমন্বয়।

মাওলানা আজাদ এ ক্ষেত্রে আরও একধাপ এগিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯১২ সালে তাঁর সম্পাদিত 'আল-হিলাল' পত্রিকায় লেখার সময় তিনি ইসলামী শাসনব্যবস্থা এবং ১৭৮৯ সালের বিপ্লব থেকে উদ্ভূত ফরাসি সংবিধানের গণতান্ত্রিক আদর্শের মধ্যকার গভীর সাদৃশ্যগুলো তুলে ধরেন। তিনি যুক্তি দেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থাটি ছিল পরামর্শ, সমতা এবং জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা গণতান্ত্রিক শাসনেরই একটি আদি ও প্রকৃত রূপ। আজাদের মতে, ইসলাম সহজাতভাবেই গণতন্ত্রের চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ এবং এটি এমন কোনো সরকারকে সমর্থন করে না যার কোনো সাংবিধানিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক ভিত্তি নেই।

আরব বিশ্বে জামাল আল-দ্বীন আল-আফগানি, মুহাম্মদ আবদুহ এবং রশীদ রিদার মতো সংস্কারকেরাও স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন এবং পরামর্শমূলক শাসনব্যবস্থার পক্ষে জোরালো বক্তব্য রেখেছিলেন। তাঁরা শূরা (পরামর্শ), ইজতিহাদ (স্বাধীন চিন্তাভাবনা) এবং মাসলাহা (জনস্বার্থ)-এর মতো ধারণাগুলোকে জনপ্রিয় করে তোলেন,

যেগুলোকে তাঁরা রাজনৈতিক সংস্কার এবং সামাজিক অগ্রগতির জন্য অপরিহার্য ব্যবস্থা হিসেবে দেখতেন। এই চিন্তাবিদদের মতে, ইসলামী সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক জাগরণ এবং আরও বেশি অংশগ্রহণমূলক শাসনব্যবস্থা–উভয়ই প্রয়োজন ছিল। যদিও মুসলিম পণ্ডিতেরা কয়েক দশক ধরে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে আসছিলেন, তবে 'ইসলামী গণতন্ত্র' পরিভাষাটি ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে আরও ব্যাপক পরিচিতি লাভ করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক নোয়াহ ফেল্ডম্যানের মতে, ইসলাম ও গণতন্ত্র সহাবস্থান করতে পারে কি না–এই প্রশ্নটি আর কেবল একটি তাত্ত্বিক বা একাডেমিক আলোচনার বিষয় হয়ে থাকেনি, বরং এটি ব্যবহারিক রাজনৈতিক গুরুত্বের একটি প্রধান অনুষঙ্গ হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে বেশ কয়েকটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে ইসলামপন্থী দলগুলোর উত্থান এবং নির্বাচনী পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বইপত্র, গবেষণামূলক প্রবন্ধ, ধর্মীয় মতামত ও রাজনৈতিক আন্দোলনগুলোতে এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপকভাবে বিতর্ক ও চুলচেরা বিশ্লেষণ হয়েছে।

তবে সব পণ্ডিতই কিন্তু একমত নন যে ইসলাম ও গণতন্ত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ। সমালোচকেরা যুক্তি দেখান যে, কিছু পশ্চিমা গণতান্ত্রিক ধারণা এবং ইসলামী রাজনৈতিক কর্তৃত্বের ঐতিহ্যগত ব্যাখ্যার মধ্যে এক ধরনের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব বা টানাপোড়েন রয়েছে। তা সত্ত্বেও, বর্তমান সময়ের প্রধান বিতর্কটি কিন্তু 'পূর্ণ সামঞ্জস্য' বনাম 'পূর্ণ অসামঞ্জস্য'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়; বরং বিতর্কটি মূলত এই বিষয়ে যে, আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে কতটুকু ইসলামী মূল্যবোধের সাথে মানিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং আধুনিক শাসনব্যবস্থায় ইসলামী নীতিগুলো কীভাবে ইতিবাচক অবদান রাখতে পারে।

সামঞ্জস্যের পক্ষের প্রবক্তারা প্রায়শই ইসলামের বেশ কিছু মৌলিক ধারণা ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার ওপর জোর দিয়ে থাকেন, যার মধ্যে রয়েছে খিলাফত (প্রতিনিধিত্ব ও দায়িত্বশীলতা), শূরা (পরামর্শ), ইজমা (ঐক্যমত), ইজতিহাদ (স্বাধীন চিন্তাভাবনা), বায়'আত (আনুগত্যের শপথ) এবং মাসলাহা (জনকল্যাণ)। তাঁরা ইসলামী শিক্ষার গভীরে প্রোথিত আরও কিছু ব্যাপক নৈতিক মূল্যবোধকেও সমান গুরুত্ব দেন, যেমন-ন্যায়বিচার, সমতা, স্বাধীনতা, মানবমর্যাদা, জবাবদিহিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, শান্তি এবং জনস্বার্থের সুরক্ষা। সামগ্রিকভাবে, এই নীতিগুলোকে একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার এবং গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

অনেক আধুনিকতাবাদী ও সংস্কারপন্থী মুসলিম চিন্তাবিদ এবং অসংখ্য পশ্চিমা পণ্ডিতের যুক্তি হলো-গণতন্ত্রকে কেবল কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো বা নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে দেখা উচিত নয়, বরং এটিকে একটি সার্বিক মূল্যবোধের ব্যবস্থা হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, গণতন্ত্রের মূল চেতনা-যেমন পরামর্শ, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ এবং আইনের শাসন-ইসলামী ঐতিহ্যের সাথে গভীরভাবে সংগতিপূর্ণ। অতএব, গণতন্ত্রকে পশ্চিম থেকে ধার করা কোনো কৃত্রিম বা ভিনদেশি কাঠামো হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই; বরং স্থানীয় ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সাথে মানিয়ে নিয়ে এটিকে এমন একটি স্বকীয় রাজনৈতিক কাঠামো হিসেবে রূপ দেওয়া সম্ভব, যা ইসলামী নীতিমালার সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

এই আলোচনায় যাঁরা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, সেই আন্তর্জাতিক পণ্ডিতদের মধ্যে রয়েছেন জন এস্পোসিটো, জন ভল, ডেল আইকেলম্যান, জেমস পিসকাটোরি, নোয়াহ ফেল্ডম্যান, আবদুলআজিজ সাচেদিনা, আসিফ বায়াত, খালেদ আবু আল-ফাদল, আবদেলওয়াহাব আল-আফেন্দী, আবদু ফিলালি-আনসারী, মুক্তেদার খান এবং নাদের হাশেমী। যদিও তাঁদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি বা তাত্ত্বিক কাঠামো ভিন্ন, তবে তাঁরা সাধারণত এই বিষয়ে একমত যে-ইসলামী বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের মধ্যে এমন কিছু ধারণা ও মূল্যবোধ নিহিত রয়েছে, যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় দিক থেকেই সমর্থন করতে সক্ষম।

একই সাথে, ইসলাম ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্যতার পক্ষে যারা কথা বলেন, তাদের খুব কম মানুষই পশ্চিমা গণতান্ত্রিক মডেল পুরোপুরি বা হুবহু গ্রহণ করার পক্ষে বলেন। তাদের অধিকাংশেরই বক্তব্য এই যে, দর্শন এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর দিক থেকে দুই ব্যবস্থার মধ্যে বড় ধরনের কিছু পার্থক্য রয়েই গেছে। তাই মূল চ্যালেঞ্জটি পশ্চিমা ব্যবস্থার অন্ধ অনুকরণ করা নয়; বরং এমন একটি কল্যাণমুখী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা, যা গণতান্ত্রিক অংশগ্রহণের পাশাপাশি ইসলামের নৈতিক ও আইনি ঐতিহ্যের সাথে চমৎকারভাবে মিশে যাবে।

পরিশেষে, ইসলাম ও গণতন্ত্রের সামঞ্জস্য নিয়ে বিতর্কের পাশাপাশি তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত ভাষা বা পরিভাষা নিয়েও আলোচনা চলছে। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী ও তাত্ত্বিকদের পক্ষ থেকে বেশ কিছু পরিভাষার প্রস্তাব করা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে 'ইসলামী গণতন্ত্র', 'ঐশ্বরিক-গণতন্ত্র' (থিও-ডেমোক্রেসি), 'শূরাতন্ত্র' (শূরাক্রেসি) এবং 'ইসলামী গণতান্ত্রিক সরকার'। নামের এই বৈচিত্র্য একটি গভীর সত্যকেই প্রতিফলিত করে: আর তা হলো এমন একটি যুগোপযোগী রাজনৈতিক মডেলের অনুসন্ধান, যা একই সাথে ইসলামী মূল্যবোধের প্রতি বিশ্বস্ত থাকবে এবং অংশগ্রহণ, জবাবদিহিতা ও সুশাসনের মতো সমসাময়িক বৈশ্বিক দাবিগুলোর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সফলভাবে সাড়া দেবে।

কেউ একে 'ইসলামী গণতন্ত্র' বলুক আর 'ইসলামের ভেতর গণতন্ত্র' বলুক, এর মূল নির্যাস ও সিদ্ধান্তটি কিন্তু একই থাকে। প্রশ্নটি এখন আর এটি নয় যে মুসলিমরা গণতান্ত্রিক ধারণাকে গ্রহণ করতে পারবে কি না, বরং আসল প্রশ্ন হলো কীভাবে গণতান্ত্রিক নীতিগুলোকে ইসলামী নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের আবহে অর্থপূর্ণভাবে রূপ দেওয়া বা গেঁথে দেওয়া যায়। সেই অর্থে, এই দীর্ঘ বিতর্কটি সংঘাতের চেয়ে বরং সংগতির (মিলনের) দিকেই বেশি নির্দেশ করে-যা আধুনিক বিশ্বে বিশ্বাস, স্বাধীনতা এবং রাজনৈতিক বৈধতার মধ্যে সমন্বয় সাধনের একটি চলমান ও প্রগতিশীল প্রচেষ্টা। ■

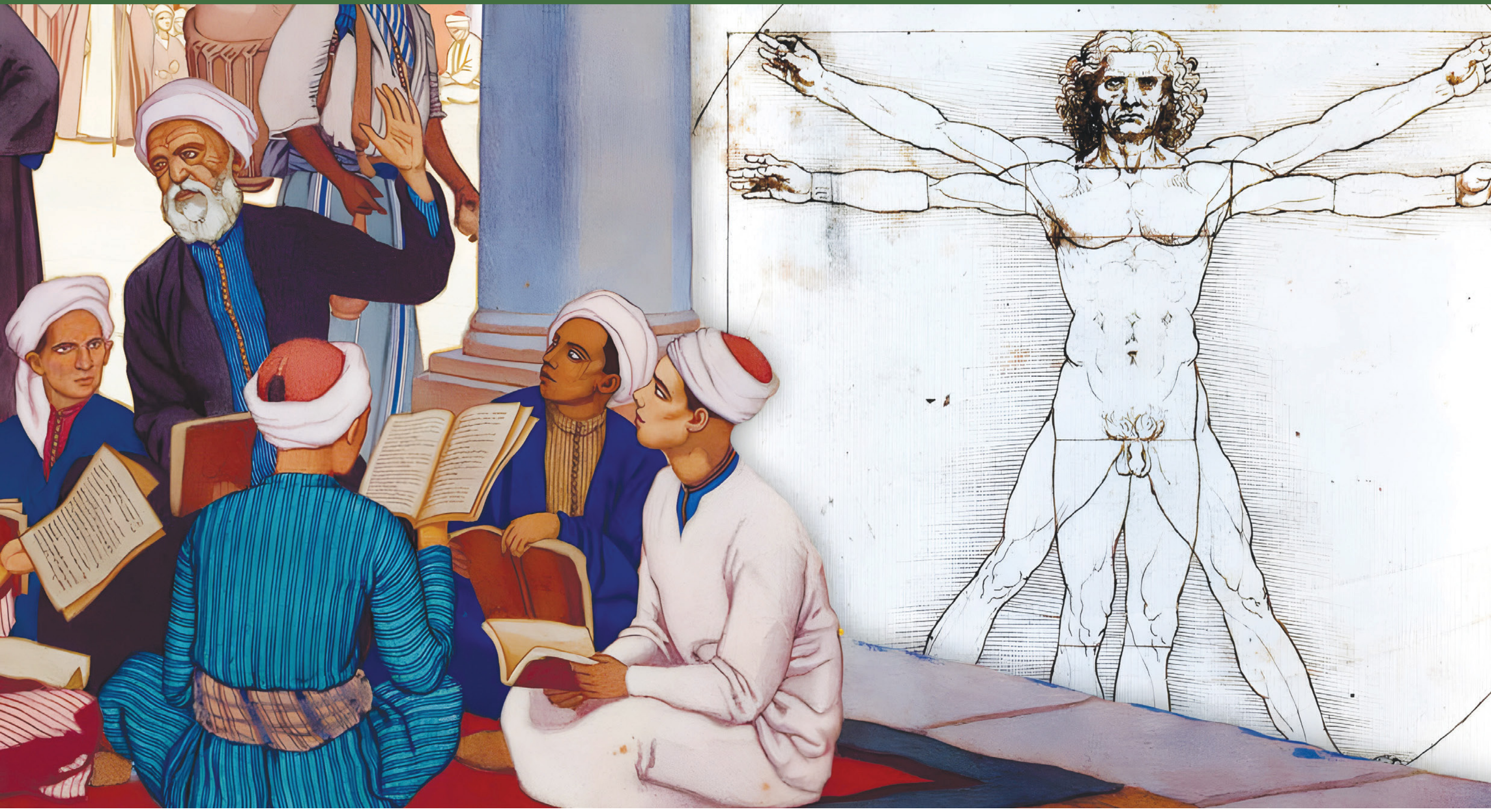

অন্ধকার যুগের আলোঃ বিশ্বকে বদলে দেওয়া মুসলিম পন্ডিতেরা

ডা. এম. বশীর আহমেদ, এম.ডি.
সাবেক মনোরোগবিদ্যার অধ্যাপক, সাউথওয়েস্টার্ন মেডিকেল স্কুল, ডালাস, টেক্সাস

'ডার্ক এজ' বা অন্ধকার যুগ বলতে পশ্চিম ইউরোপীয় ইতিহাসের প্রাথমিক মধ্যযুগীয় সময়কালকে বোঝায়, যা স্থূলভাবে ৫০০ থেকে ১০০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এ সময় পশ্চিমে কোনো রোমান (বা পবিত্র রোমান) সম্রাটের শাসন ছিল না। শব্দটি প্রায়শই একটি নেতিবাচক অর্থ বহন করে–যা বুদ্ধিবৃত্তিক স্থবিরতা এবং বর্বরতার এক অধ্যায়কে নির্দেশ করে (ডার্ক এজ–এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, ২০১০)। যদিও শব্দগুচ্ছটি নিরপেক্ষ অর্থে ব্যবহারের দাবি করা হয়, তবে তা মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপে (বিশেষ করে স্পেনে) একই সময়ে অর্জিত বৈজ্ঞানিক ও পণ্ডিতসুলভ অনন্য সাফল্যগুলোকে স্বীকৃতি দিতে স্পষ্টভাবেই ব্যর্থ হয়।

প্রাচীন গ্রীক, মিশরীয় এবং ব্যাবিলনীয়রা দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, পদার্থবিদ্যা ও গণিতসহ মানব সভ্যতায় কী অবদান রেখেছিল–সে সম্পর্কে পশ্চিমারা বেশ ভালোভাবেই অবগত। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই সক্রেটিস, অ্যারিস্টটল, টলেমি, গ্যালেন এবং পাইথাগোরাসের নাম শুনেছি। তবে, খুব কম মানুষই আল-কিন্দি, ইবনে সিনা, আল-রাজি, আল-

জাহরাউই, ইবনে আল-হাইথাম কিংবা ইবনে খালদুনের মতো মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান সম্পর্কে জানেন; যাঁরা সপ্তম থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যে–ঠিক 'ডার্ক এজ' বা অন্ধকার যুগ নামক সময়কালেই–বিজ্ঞানের প্রসারে সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। অন্ধকার যুগের কারণ এবং ইউরোপীয় রেনেসাঁ সম্পর্কে গভীরতর অধ্যয়ন অবধারিতভাবে একটি সিদ্ধান্তেই উপনীত করে: মুসলিম পণ্ডিতরাই ছিলেন অন্ধকার যুগের প্রকৃত আলো।

মাত্র একশো বছরের ব্যবধানে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা ইউরোপকে প্রায় পাঁচ শতাব্দীর জন্য এক গভীর অন্ধকার ও অজ্ঞতার সাগরে ঠেলে দিয়েছিল। এর মধ্যে প্রথমটি ছিল ৪৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাইজেন্টাইন সম্রাট জেনো কর্তৃক এডেসা (প্রাচীন মেসোপটেমিয়া)-র 'স্কুল অব হিপোক্রেটিক মেডিসিন' বন্ধ করে দেওয়া। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ৫২৯ খ্রিস্টাব্দে, যখন চার্চের মতবাদের বাইরে গিয়ে আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক সত্যের সন্ধান করার অপরাধে সম্রাট জাস্টিনিয়ান এথেন্সের ঐতিহ্যবাহী 'একাডেমি' ধ্বংস ও বন্ধ করে দেন। এর ফলে, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এডেসা এবং এথেন্স থেকে শত শত পণ্ডিত পালিয়ে গিয়ে জুন্দিশাপুরে আশ্রয় নেন।

খুজিস্তানের অন্তর্গত জুন্দিশাপুর শহরটি সাসানীয় সম্রাট শাপুর (২৪১-২৭২ খ্রিস্টাব্দ) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি সেখানে একটি মেডিকেল স্কুল এবং একটি হাসপাতালসহ একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেন, যেখানে গ্রীকো-সিরিয়াক চিকিৎসাশাস্ত্র বিকশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ৭৩৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় খলিফা ওমরের শাসনামলে মুসলমানরা শহরটি জয় করে; ততদিনে সেখানে একটি সুপ্রতিষ্ঠিত হাসপাতাল ও মেডিকেল স্কুল গড়ে উঠেছিল।

খলিফা হারুন আল-রশিদের শাসনামলে বাগদাদ খিলাফতের রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি অসংখ্য হাসপাতাল ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করেন, যার ফলে বুদ্ধিবৃত্তিক কর্মকাণ্ড উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই শিক্ষামূলক আন্দোলন একটি জ্ঞানালোক যুগের সূচনা করে। এ সময় জুন্দিশাপুরসহ বিশ্বের অন্যান্য প্রান্ত থেকে অনেক নামী চিকিৎসক ও পণ্ডিত বাগদাদে স্থানান্তরিত হন।

পবিত্র কুরআনের নির্দেশনা এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বাণী জ্ঞানার্জনকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছিল, যার ফলে মধ্যযুগে এক অনন্য ও উন্নত সভ্যতার বিকাশ ঘটে। আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, যখন এই সভ্যতা সাফল্যের চূড়ায় অবস্থান করছিল, তখন মুসলিম বিশ্ব বিজ্ঞান–বিশেষ করে গণিত ও চিকিৎসাশাস্ত্রে–অভূতপূর্ব অবদান রাখে। বাগদাদ এবং স্পেনের কর্ডোভায় এমন সব চমৎকার বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল, যেখানে জ্ঞানের সন্ধানে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর ঢল নামত। তৎকালীন শাসকরা সবসময় বিজ্ঞানী, গবেষক আর শিল্পীদের কদর করতেন এবং তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন। সেখানে বৈজ্ঞানিক স্বাধীনতার এমন এক চমৎকার পরিবেশ ছিল, যেখানে ইহুদি, খ্রিস্টান ও মুসলমানরা কোনো বৈষম্য ছাড়াই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতেন (ফ্রান্সিস ঘিলস, ১৯৮৩)।

আব্বাসীয় খলিফারা ৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে বাগদাদে গড়ে তোলেন কিংবদন্তী গবেষণাকেন্দ্র 'বাইতুল হিকমাহ' বা 'জ্ঞানের ঘর'। এটি এতটাই উন্নত ছিল যে, পরবর্তীতে পঞ্চদশ শতকে ইংল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত রয়্যাল কলেজ বা রাজকীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর সাথে এর তুলনা করা যায়। অনেকেই মনে করেন অক্সফোর্ড (১১৬৭), কেমব্রিজ (১২০৯) কিংবা হার্ভার্ড (১৬৩৬) হয়তো পৃথিবীর সবচেয়ে পুরোনো বিশ্ববিদ্যালয়; কিন্তু ধারণাটি ভুল। মরক্কোর ফেজ শহরে ৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত 'আল-কারাউইয়িন বিশ্ববিদ্যালয়' হলো পৃথিবীর ইতিহাসের সবচেয়ে প্রাচীন এবং আজও সচল থাকা ডিগ্রি প্রদানকারী বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া কায়রোর আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (৯৭০ খ্রিস্টাব্দ) এবং বাগদাদের নিজামিয়া কলেজও (১০৬৭) বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এই মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষাপদ্ধতি দশম ও একাদশ শতকের ক্রুসেডারদের সাথে আসা ইউরোপীয় সন্ন্যাসীদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল। পরবর্তীতে তাঁরাই ইতাহির সালের্নো ও বোলোগনা বিশ্ববিদ্যালয় (১০৮৮), ইংল্যান্ডের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় (১১৬৭) এবং প্যারিসের সোরবোন বিশ্ববিদ্যালয় (১১৫০) প্রতিষ্ঠায় মূল ভূমিকা রাখেন।

সেই গৌরবময় সময়ে মুসলিম বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু বা রাজধানী ছিল স্পেনের কর্ডোভা। নবম ও দশম শতাব্দীর দিকে লন্ডন যখন রাস্তার বাতিহীন এক সাধারণ ছোট শহর, কর্ডোভা তখন ঝলমলে এক মেগাসিটি! সেখানে প্রায় পাঁচ লাখ মানুষের বসবাস ছিল। শহরটিতে ছিল ১ লক্ষ ১৩ হাজার বাড়ি, ৭০০টি মসজিদ, ৩০০টি পাবলিক বাথ, ৪০টি আধুনিক হাসপাতাল এবং অসংখ্য বইয়ের দোকান। শুধু তাই নয়, সেখানে ৭০টি লাইব্রেরি ছিল, যাতে সংরক্ষিত ছিল প্রায় পাঁচ লাখ বই। ইতিহাসবিদ বার্কের (১৯৭৮) মতে, 'প্রথম সহস্রাব্দের শেষের দিকে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের শিক্ষার্থীরা বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রে উচ্চশিক্ষা নিতে কর্ডোভায় আসত এবং মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদি পণ্ডিতদের সান্নিধ্যে বসে জ্ঞান অর্জন করত।'

নিচে এমন কয়েকজন খ্যাতনামা মুসলিম মনীষীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হলো, যাঁদের মৌলিক চিন্তাভাবনা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, ইতিহাস, গণিত, রসায়ন এবং চিকিৎসা ও সমাজবিজ্ঞানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে:

- আল-খাওয়ারিজমি (৭৭০-৮৪০): তিনি বীজগণিতের মূল নিয়ম ও সমীকরণ সমাধানের পদ্ধতি (আল-জাবর ওয়াল-মুকাবালা) আবিষ্কার করেন। গণিতকে বাস্তব জীবনে কীভাবে কাজে লাগানো যায়, তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তার ফলেই তা প্রথম সম্ভব হয়। ইউরোপের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ১৬ শতক পর্যন্ত তাঁর লেখা বীজগণিতের বই পড়ানো হতো।
- জাবির ইবনে হাইয়ান (৭১৫-৮০০): রসায়ন শাস্ত্রে তিনিই প্রথম পরীক্ষামূলক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা করেন। নিখুঁত পাতন (distillation), তরলীকরণ, স্ফটিকীকরণ এবং জারণের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উদ্ভাবক তিনি।

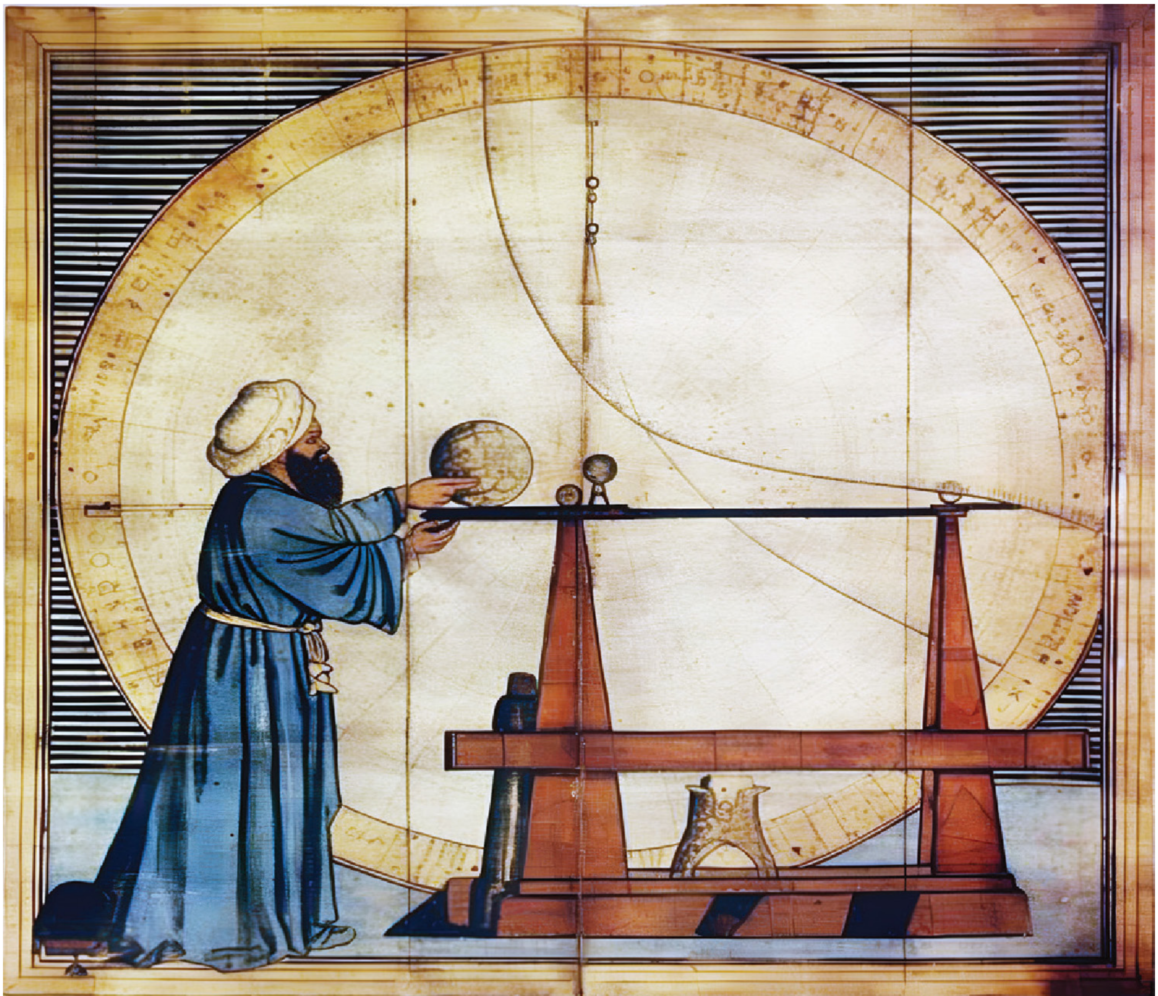

- ইবনে ইসহাক আল-কিন্দী (৮০০-৮৭৩): বাগদাদের 'বাইতুল হিকমাহ'-তে বসে তিনি দর্শন, আলোকবিজ্ঞান, চিকিৎসা, গণিত ও ধাতুবিদ্যা নিয়ে কাজ করেন। চমৎকার সব সুগন্ধি তৈরির ১০৭টি ফর্মুলাও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন।

- আব্বাস ইবনে ফিরনাস (৮১০-৮৮৭): স্পেনের কর্ডোভায় বড় ডানার মতো এক বিশেষ ধরনের পোশাক তৈরি করে তিনি আকাশে ওড়ার প্রথম ঐতিহাসিক প্রয়াস চালিয়েছিলেন।

- আল-বাত্তানি (৮৫৮-৯২৯): জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং ত্রিকোণমিতির (trigonometry) উন্নয়নে তাঁর অবদান অসামান্য।

- আল-রাজি (৮৬৪-৯৩০): চিকিৎসাশাস্ত্র, চক্ষুরোগ, গুটিবসন্তের চিকিৎসা এবং রসায়নে তিনি বিরাট অবদান রাখেন। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ইউরোপের মেডিকেল কলেজগুলোতে তাঁর লেখা বই পাঠ্যপুস্তক হিসেবে পড়ানো হতো।

- আল-জাহরাউই (৯৩৬-১০১৩): চিকিৎসাবিজ্ঞানে অস্ত্রোপচার বা 'সার্জারি'-কে প্রথম আলাদা একটি স্বতন্ত্র শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন তিনি। এজন্য তাঁকে 'সার্জারির জনক' বলা হয়। তাঁর লেখা ৩০ খণ্ডের চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'কিতাব আল-তাসরিফ' প্রায় ৫০০ বছর ধরে মুসলিম ও ইউরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রধান পাঠ্যবই ছিল।

- আবুল হাসান আল-মাসুদি (৮৯৬-৯৫৬): তিনি ছিলেন একাধারে ইতিহাসবিদ ও পরিব্রাজক। ভূগোলে তাঁর অবদান অনেক। আজারবাইজানের বাকু তেল খনির প্রথম বিবরণ তিনিই দেন, যার ফলে সেখানে বাণিজ্যিক খনিজ শিল্পের পথ সুগম হয়।

- ইবনে আল-হাইথাম (৯৬৫-১০৪০): আধুনিক আলোকবিজ্ঞানের (optics) জনক। তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী যিনি কেবল কল্পনার ওপর নির্ভর না করে বাস্তব পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞান চর্চার প্রবর্তন করেন। ইউক্লিড ও টলেমির 'চোখ থেকে আলো বের হয়ে বস্তু দেখে-এই ভুল তত্ত্ব ভেঙে দিয়ে তিনি প্রমাণ করেন, বস্তুর ওপর আলো প্রতিফলিত হয়ে আমাদের

চোখে আসে বলেই আমরা দেখতে পাই।

- আল-মাওয়ার্দি (৯৭২-১০৫৮): রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং আইনশাস্ত্রের ওপর তিনি অত্যন্ত মূল্যবান ও বিস্তারিত তত্ত্ব প্রদান করে গেছেন।
- আবু রায়হান আল-বিরুনি (৯৭৩-১০৪৮): এই মহান জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও গণিতবিদ গ্যালিলিওর প্রায় ৬০০ বছর আগেই পৃথিবীর পরিধি নিখুঁতভাবে পরিমাপ করেছিলেন। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন যে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি আসলে অসংখ্য তারার এক বিশাল সমষ্টি।
- ইবনে সিনা (৯৮১-১০৩৭): তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সেরা চিকিৎসক। তাঁর লেখা বিখ্যাত চিকিৎসা বিশ্বকোষ 'আল-কানুন ফিত তিব' (The Canon of Medicine) ১৬ শতক পর্যন্ত ইউরোপের নামী-দামী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হতো। নতুন কোনো ওষুধের কার্যকারিতা পরীক্ষার নিয়মাবলী তিনিই প্রথম তৈরি করেন। এছাড়া দর্শন, গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ওপর তাঁর প্রায় ২০০টি গ্রন্থ রয়েছে।
- ওমর খৈয়াম (১০৪৪-১১২৩): একাধারে গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও কালজয়ী কবি। তিনি এনালিটিক্যাল এবং নন-ইউক্লিডীয় জ্যামিতির মজবুত ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।
- ইবনে জুহর (১১০০-১১৬১): এই কুশলী সার্জন শ্বাসনালীতে অস্ত্রোপচারের (tracheotomy) পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হিপোক্রেটিস ও গ্যালেনের প্রাচীন ও ত্রুটিপূর্ণ চিকিৎসাতত্ত্বের ভুলগুলো তিনি বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করেছিলেন।
- ইবনে আল-নাফিস (১২১৩-১২৮৮): তিনি ৪৩ খণ্ডের এক বিশাল চিকিৎসা বিশ্বকোষ রচনা করেন। বিখ্যাত বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্ভির ৪০০ বছর আগেই তিনি ফুসফুসে রক্তসঞ্চালন প্রক্রিয়া (pulmonary circulation) আবিষ্কার করেছিলেন। তবে হার্ভি পরবর্তীতে নিজের গবেষণায় ইবনে আল-নাফিসের নাম উল্লেখ করেননি।
- মুহাম্মদ আল-ইদ্রিসি (১১০০-১১৬৬): ইতিহাসের প্রথম সারির ভূগোলবিদদের একজন, যিনি পৃথিবীর মানচিত্র এবং প্রথম গ্লোব তৈরি করেছিলেন। সিসিলির রাজা দ্বিতীয় রজার তাঁর এই কাজের সম্মানার্থে প্রায় ৪০০ পাউন্ড ওজনের একটি রূপার গোলকের ওপর সেই মানচিত্রটি খোদাই করিয়েছিলেন। তাঁর লেখা 'দ্য বুক অব রজার' ভূগোলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর গ্রন্থ।
- জালাল উদ্দিন রুমি (১২০৭-১২৭৩): পারস্যের অন্যতম সেরা ও জনপ্রিয় সুফি কবি, যিনি জীবনের অধিকাংশ সময় তুরস্কে কাটিয়েছেন। আত্মিক মুক্তি, আধ্যাত্মিক আলো আর খোদাপ্রেমের ওপর লেখা তাঁর মর্মস্পর্শী কবিতা আজও বিশ্বজুড়ে সমাদৃত।
- ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬): সমাজ ও সামাজিক পরিবর্তনের গতিপ্রকৃতি ব্যাখ্যার জন্য তিনি 'ইলম আল-উমরান' (সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিজ্ঞান) নামের এক নতুন সমাজবিজ্ঞানের জন্ম দেন। মানুষ কীভাবে যাযাবর জীবন ছেড়ে নগরের পত্তন করে এবং কেন একসময় সেই সমৃদ্ধ নগরগুলো ধ্বংস হয়ে অন্য যাযাবর শক্তির হাতে চলে যায়-তার এক অসামান্য ও নিখুঁত রাজনৈতিক ও সামাজিক বিশ্লেষণ তিনি দেখিয়েছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ইতিহাসে তাঁর এই কাজকে যেকোনো যুগের অন্যতম সেরা বুদ্ধিবৃত্তিক অর্জন হিসেবে গণ্য করা হয়।

রবার্ট ব্রিফাল্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'দ্য মেকিং অব হিউম্যানিটি'-তে লিখেছেন: 'আজ আমরা যাকে আধুনিক বিজ্ঞান বলি, তার মূল ভিত্তি হলো নিত্যনতুন পরীক্ষা-পরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ আর নিখুঁত পরিমাপ পদ্ধতি। আর এই পদ্ধতিগুলোর সাথে ইউরোপকে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল আরবরাই। আধুনিক পৃথিবীর বুকে আরব সভ্যতার সবচেয়ে অর্থপূর্ণ ও শ্রেষ্ঠ অবদান হলো এই বিজ্ঞান।

'ইসলামের মর্মার্থ নিয়ে পশ্চিমা বিশ্বে যেমন অনেক জানাশোনা আছে, ঠিক তেমনি আমাদের সংস্কৃতি ও সভ্যতা যে মুসলিম বিশ্বের কাছে কতটা ঋণী-সে বিষয়ে এক বিশাল অজ্ঞতাও রয়ে গেছে। মধ্যযুগের মুসলিম বিশ্ব ছিল এমন এক চারণভূমি, যেখানে গবেষক আর জ্ঞানীদের কদর ছিল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু আমরা ইসলামকে সবসময় পশ্চিমের শত্রু এবং এক ভিন্ন ধারার সংস্কৃতি, সমাজ ও বিশ্বাস হিসেবে দেখে এসেছি। আর এই কারণেই আমাদের নিজেদের ইতিহাসের সাথে ইসলামের গভীর সংযোগকে আমরা বারবার এড়িয়ে গেছি কিংবা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছি। অথচ মানুষের অগ্রযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে-অতীতে এবং বর্তমানে-ইসলাম আমাদেরই একটি অংশ। আজকের আধুনিক ইউরোপ গড়ে তোলার পেছনে ইসলামের বড় ভূমিকা রয়েছে। -অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রিন্স চার্লস (তৎকালীন এইচ.আর.এইচ.), ১৯৯৩

আমি হিউলেট প্যাকার্ড (এইচপি)-এর সাবেক চেয়ারম্যান ও সিইও কার্লি ফিওরিনার একটি চমৎকার উক্তি দিয়ে লেখাটি শেষ করতে চাই। ২০০১ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান তুলে ধরে তিনি বলেছিলেন: 'এই সভ্যতা অন্য যেকোনো কিছুর চেয়ে নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় বুঁদ ছিল। এর স্থপতিরা এমন সব অসাধারণ ইমারত তৈরি করেছিলেন, যা দেখে মনে হতো তা যেন মাধ্যাকর্ষণকেও বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। এর গণিতবিদরা আবিষ্কার করেছিলেন বীজগণিত আর অ্যালগরিদম, যা আজকের কম্পিউটার তৈরি আর তথ্য সুরক্ষার (encryption) মূল ভিত্তি। এর চিকিৎসকরা মানুষের শরীর নিয়ে গবেষণা করে নিত্যনতুন রোগের নিরাময় খুঁজে বের করেছিলেন। আর এর জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা আকাশের বুকে দৃষ্টি মেলে তারকারাজির নামকরণ করেছিলেন এবং উন্মোচন করেছিলেন মহাকাশ জয়ের পথ। এই সভ্যতা থেকে হয়তো আজ আমরা একটা বড় শিক্ষা নিতে পারি-তৎকালীন মুসলিম নেতৃত্ব ইহুদি, খ্রিস্টান ও ইসলামি ঐতিহ্যের এক বৈচিত্র্যময় জনশক্তির পূর্ণ মেধাকে একসাথে কাজে লাগাতে পেরেছিল। ■

মহামারি, যন্ত্রণা ও তুলির আঁচড়: সংকট যেভাবে জন্ম দেয় সৃজনশীলতার

মূল ভাবনা: শেক্সপিয়র থেকে নির্জনতা–ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষীরা যেভাবে মহামারির যন্ত্রণাকে সৃজনশীল শক্তিতে রূপান্তর করেছিলেন, এবং আপনিও যেভাবে তা পারেন।

তাসনুভা জাহান
সহকারী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ,
নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারি আমাদের দৈনন্দিন জীবনের চেনা নকশায় একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে গেছে। মানুষ এখনও এমন এক জীবনযাত্রার খোঁজ করছে, যা আরও সামাজিক এবং আনন্দদায়ক। আমরা মানব ইতিহাসের এমন এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী সময় পার করেছি, যা আধুনিক যুগে আর কখনো দেখা যায়নি। আমাদের চিরচেনা 'স্বাভাবিক' জীবন ওলটপালট হয়ে গেছে; ব্যাহত হয়েছে দৈনন্দিন জীবন ও কাজের চিরন্তন ভারসাম্য। শারীরিক ও মানসিকভাবে আমরা সবাই এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গিয়েছি।

এই নতুন বাস্তবতার সাথে মানিয়ে নেওয়ার লড়াইয়ে আমাদের ডিজিটাল এবং অ্যানালগ (বাস্তব) জগতের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার এক নিরন্তর সংগ্রাম চলছে। ভবিষ্যতের জনস্বাস্থ্য সংকট এড়াতে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনলাইন অর্ডার, দূরশিক্ষণ, দূরনিয়ন্ত্রিত অফিস (রিমোট অফিস), টেলি-মেডিসিন সেবা এবং নানা ডিজিটাল কার্যক্রম সাহায্য করছে। প্রযুক্তিগত এই সহায়তা সত্যিই ফলপ্রসূ, তবে আমরা মানুষের পারস্পরিক স্পর্শ, আত্মিক যোগাযোগ এবং ইন্দ্রিয়গত উদ্দীপনাকে অস্বীকার করতে পারি না। এটি এমন এক বৈশ্বিক অতিমারি ছিল, যার মুখোমুখি পুরো বিশ্ব একযোগে হয়েছে। কেউ কেউ এই পরিস্থিতিকে বেশ যৌক্তিকভাবে মোকাবিলা করেছেন; আবার অনেকে তীব্র উদ্বেগ ও মানসিক চাপে ভুগেছেন। লকডাউনের দীর্ঘস্থায়ী একাকীত্ব মানুষের জীবনযাত্রায় বড় ধরনের স্থবিরতা এনেছিল, যা বয়ে এনেছিল কষ্ট আর অস্বস্তি।

নেতিবাচক চিন্তার জাল ও সৃজনশীলতার ধ্যান

মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা অনুযায়ী, একজন সাধারণ মানুষের মাথায় প্রতিদিন প্রায় ১২,০০০ থেকে ৬০,০০০ চিন্তা আসে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, এর মধ্যে প্রায় ৮০% চিন্তাই নেতিবাচক এবং ৯৫% একই চিন্তার পুনরাবৃত্তি। স্পষ্টতই, এই বৃত্তাকার ভাবনা আমাদের মানসিক শক্তির অপচয় ঘটায়। মহামারির দিনগুলোতে এই সুপ্ত নেতিবাচক চিন্তাগুলো আরও বিরক্তিকর হয়ে আমাদের মনের ওপর চড়াও হয়েছিল। আমরা যদি ক্রমাগত এই নেতিবাচকতার পুনরাবৃত্তি করতে থাকি, তবে তা আমাদের ভাবনার চেয়েও গভীর মানসিক অবসাদের দিকে নিয়ে যায়। এই কোয়ারেন্টাইন বা আইসোলেশনের একাকীত্ব থেকে আমাদের সবাইকে আবার মানসিক শক্তিতে ঘুরে দাঁড়াতে হবে।

শুরুতে কিছুটা দ্বিধা থাকলেও, মানুষ আস্তে আস্তে নিজের ভেতরে সৃজনশীলতার আলো খুঁজে পায়। যেকোনো সৃজনশীল কাজ মনকে এক জায়গায় স্থির করতে সাহায্য করে। এটি মস্তিষ্ককে শান্ত করে বলে একে এক ধরণের 'ধ্যান' বা মেডিটেশনের সাথেও তুলনা করা যায়।

এই লকডাউন বা কোয়ারেন্টাইনকে তাই একটি সুযোগ হিসেবেও দেখা যায়। এই সময়ে আমাদের যাতায়াতের ঝামেলা ছিল না, কর্মক্ষেত্রের মনোযোগ বিঘ্নিত হওয়ার চিরচেনা উপাদানগুলো ছিল না, কিংবা নিয়মিত ইমেইল বা ফোন কলের চাপও কিছুটা কম ছিল। এটি একটি উর্বর মগজের জন্য নতুন চিন্তার দুয়ার খুলে দেয়। যেকোনো সৃজনশীল কাজ–তা শিল্পসম্মত হোক বা না হোক, সফল হোক বা ব্যর্থ–মস্তিষ্কে একটি ইতিবাচক অনুভূতির হরমোন ক্ষরণ করে এবং সুখের বার্তা বয়ে আনে। আমাদের মনে যেসব চিন্তার ঢেউ ওঠে এবং মিলিয়ে যায়, তার ওপর আমাদের কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই; কিন্তু সৃজনশীলতা আমাদের ভেতরের সেই বিমূর্ত অনুভূতিগুলোকে বাইরে এনে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। এমনকি সাধারণ বাগান করা, রান্না করা বা ঘরের একটি কোণ পরিষ্কার করার মতো কাজও মনকে দারুণ শান্ত করতে পারে।

ইতিহাসের আয়নায় মহামারি ও সৃজনশীলতার জাগরণ

প্রতিকূলতা ও অনিশ্চয়তার সময়ে সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি অন্বেষণ করা কোনো নতুন তত্ত্ব নয়। ইতিহাস বলে, মহামারির সময়ে সৃজনশীল অনুপ্রেরণার এই জাগরণ অত্যন্ত প্রাচীন। ১৭ শতকের শুরুতে, বিউবোনিক প্লেগের (Bubonic Plague) কারণে লন্ডনের থিয়েটারগুলো অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। সেই সময়ে উইলিয়াম শেক্সপিয়র ছিলেন 'কিংস মেন' থিয়েটার দলের একজন অভিনেতা এবং অংশীদার। মঞ্চ বন্ধ থাকার কারণে প্রচুর অবসর সময় পেয়ে শেক্সপিয়র ঘরে বসেই লিখে ফেলেন তাঁর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি 'কিং লিয়ার'। শুধু তাই নয়, বছর শেষ হওয়ার আগেই তিনি তাঁর অন্যতম সেরা দুই সৃষ্টি–'ম্যাকবেথ' এবং 'অ্যান্টনি অ্যান্ড ক্লিওপেট্রা'র লেখাও শুরু করে দিয়েছিলেন। ধারণা করা হয়, শেক্সপিয়র তাঁর একমাত্র পুত্র হ্যামনেট প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মাত্র ১১ বছর বয়সে মারা যাওয়ার শোক থেকেই তাঁর অমর নাটক 'হ্যামলেট' রচনা করেছিলেন।

মহামারি চলাকালীন শেক্সপিয়রই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন না যিনি তাঁর সেরা কাজগুলো তৈরি করেছিলেন। আরও বেশ কয়েকজন মেধাবী চিন্তাবিদ এবং শিল্পী ছিলেন যারা এই সামাজিক দূরত্বের সুযোগটি কাজে লাগিয়েছিলেন:

- **টমাস ন্যাশ:** এলিজাবেথীয় যুগের এই বিখ্যাত নাট্যকার ১৫৯২ সালে লন্ডনে বিউবোনিক প্লেগ হানা দিলে সংক্রমণ এড়াতে ইংল্যান্ডের গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে যান। সেই সময়ে তিনি তাঁর 'সামারস লাস্ট উইল অ্যান্ড টেস্টামেন্ট' নাটকটি লেখেন, যা মহামারিজুড়ে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই এক অনন্য শৈল্পিক প্রতিফলন।

- **জিওভান্নি বোক্কাচ্চো:** ১৩৪৮ সালে ফ্লোরেন্সে যখন বিউবোনিক প্লেগ আঘাত হানে, তখন এই ইতালীয় লেখক ও কবি সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত হন। তাঁর বাবা এবং সৎ মা এই রোগে মারা যান। তিনি শহর ছেড়ে গ্রামাঞ্চলে পালিয়ে গিয়ে এই প্রাদুর্ভাব থেকে বেঁচে যান এবং এই নির্বাসনেই তিনি তাঁর বিশ্ববিখ্যাত ক্লাসিক 'দ্য ডেকামেরন' (The Decameron) লিখেছিলেন।

- **স্যার আইজ্যাক নিউটন:** ১৬৬০-এর দশকের শেষের দিকে বিউবোনিক প্লেগের কারণে ক্যামব্রিজ ছেড়ে লিনকনশায়ারের বাড়িতে একাকী কাটানোর সময়েই নিউটন তাঁর মহাকর্ষ তত্ত্বের (Law of Gravitation) মূল ধারণাটি আবিষ্কার করেন। তরুণ এই গণিতবিদ কোয়ারেন্টাইনে থাকার সেই বছরটিতেই ক্যালকুলাসের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন এবং শোবার ঘরে প্রিজম নিয়ে নাড়াচাড়া করার সময় আলোকবিদ্যার (Optics) মৌলিক সূত্রগুলো বিকশিত করেছিলেন।

- **এডভার্ড মুঙ্ক:** ১৯১৮ সালে স্প্যানিশ ফ্লু প্রাদুর্ভাবের সময় এই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী তাঁর সৃজনশীলতার

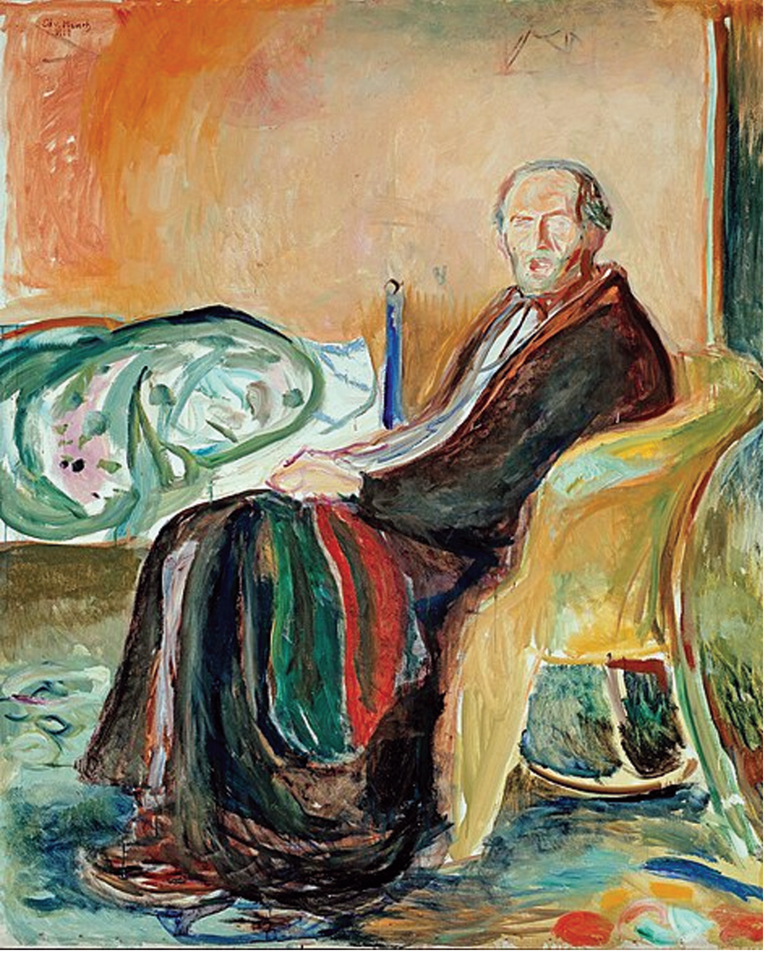

সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটান। ১৯১৯ সালের শুরুর দিকে নরওয়েতে তিনি নিজেই এই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তবে মৃত্যুর কাছে নতিস্বীকার না করে তিনি রোগশয্যা থেকেই তুলি হাতে নেন। তাঁর বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'সেলফ-পোর্ট্রেট উইথ দ্য স্প্যানিশ ফ্লু'-তে পাতলা চুল এবং রোগা মুখে নিজের রোগশয্যার করুণ ও বাস্তব চিত্র ক্যানভাসে বন্দি করেছিলেন।

ইসলামিক বিশ্ব ও বিশ্বসাহিত্যে মহামারির ক্ষত

আরব বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত পণ্ডিত, সমাজবিজ্ঞানের জনক ও ইতিহাসবিদ আবদ আল-রহমান ইবনে খালদুন ছিলেন ১৪ শতকের প্লেগ মহামারির এক সমসাময়িক সাক্ষী। মাত্র ১৭ বছর বয়সে ইবনে খালদুন তাঁর বাবা-মা এবং বেশ কয়েকজন প্রিয় শিক্ষককে এই 'ব্ল্যাক ডেথ'-এর কারণে হারান। ব্ল্যাক ডেথের এই ধ্বংসাত্মক প্রভাব তাঁকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। এর ভয়াবহতা নিয়ে তিনি তাঁর বিখ্যাত 'আল-মুকাদ্দিমাহ' গ্রন্থে লিখেছিলেন:

"চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় অঞ্চলের সভ্যতা এক বিধ্বংসী প্লেগের কবলে পড়েছিল, যা একের পর এক জাতিকে নিশ্চিহ্ন ও বিলীন করে দেয়... সভ্যতার সামগ্রিক পরিস্থিতি তখন একেবারে ধ্বংস ও বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গিয়েছিল।"

মধ্যযুগীয় ইসলামিক পাশ্চাত্যের অন্যতম প্রভাবশালী রাজবৈদ্য মুহাম্মদ আল-শাকুরিও খুব কাছ থেকে ব্ল্যাক ডেথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ১৩৪৮ সালে যখন প্লেগ ইউরোপ ও আন্দালুসিয়ার উপকূলে পৌঁছায়, তখন তিনি গ্রানাডার নাসরিদ রাজবংশের রাজবৈদ্য হিসেবে কর্মরত ছিলেন। এই মহামারির কাছে নিজে নতিস্বীকার করার আগে, শাকুরি প্লেগের চিকিৎসা ও প্রতিরোধ নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ও অত্যন্ত মূল্যবান গবেষণামূলক প্রবন্ধ রচনা করে যান।

ইতিহাসজুড়ে মহামারি নিয়ে বেশ কিছু প্রভাবশালী সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছে, যা মানবজাতির অকথ্য কষ্টের দলিল। যেমন–ড্যানিয়েল ডিফো-র 'এ জার্নাল অব দ্য প্লেগ ইয়ার'; আলেসান্দ্রো মানজোনি-র 'দ্য বিট্রোথড'; আলবেয়ার কামু-র 'দ্য প্লেগ'; এবং মাইকেল ডব্লিউ ডলসের 'প্লেগ ইন আর্লি ইসলামিক হিস্ট্রি'। এই সাহিত্যকর্মগুলোর কয়েকটি দেখায় যে, যেকোনো মহামারির প্রতি মানুষের প্রাথমিক মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়া হয় 'অস্বীকার' বা বাস্তবতাকে মেনে না নেওয়ার প্রবণতা।

১৩৪৮ সালে সিরিয়ার লেখক ও দার্শনিক ইবনে আল-ওয়ার্দী একটি প্রাণবন্ত বিবরণ লেখেন যে কীভাবে প্লেগ ভারত, চীন, পারস্য ও বৈরুতে ছড়িয়ে পড়ে দামেস্কে পৌঁছানোর আগে 'কায়রোর মানবজাতিকে ধ্বংস' করেছিল। তিনি বর্ণনা করেছিলেন, "সেখানে প্লেগ সিংহাসনে বসা এক হিংস্র সিংহের মতো জেঁকে বসেছিল এবং ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে প্রতিদিন হাজারেরও বেশি মানুষকে হত্যা করছিল।" ১৩৪৯ সালে আল-ওয়ার্দী নিজেই এই ব্ল্যাক ডেথে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

১৬৩০ সালের ইতালির বিউবোনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব নিয়ে ১৮২৭ সালে প্রকাশিত হয় আলেসান্দ্রো মানজোনির বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য বিট্রোথড'। মানজোনি দেখিয়েছেন কীভাবে মিলানের কর্তৃপক্ষ সমস্ত চিকিৎসাগত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও সংক্রমণের হুমকিকে উপেক্ষা করেছিল এবং এমনকি স্থানীয় এক রাজপুত্রের জন্মদিনের অনুষ্ঠান বাতিল করতেও অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। পর্যাপ্ত বিধিনিষেধ না থাকা, আইন প্রয়োগে শিথিলতা এবং সাধারণ মানুষের উদাসীনতার কারণে কীভাবে প্লেগ দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল, তার এক চমৎকার সামাজিক দলিল এই উপন্যাস।

আলবেয়ার কামু ও 'দ্য প্লেগ'-এর লুকানো সত্য

কোভিড-১৯-এর বৈশ্বিক প্রাদুর্ভাবের পর থেকে ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশিত আলবেয়ার কামু-র 'দ্য প্লেগ' (The Plague) বইটি আবারও বিশ্বজুড়ে 'বেস্ট সেলার' তালিকায় জায়গা করে নেয়। কামু তাঁর উপন্যাসে দেখিয়েছেন কীভাবে ১৯৪০-এর দশকে ফরাসি আলজেরিয়ার ওরান শহরের নাগরিকরা প্লেগের হুমকির বিরুদ্ধে প্রস্তুতি নিতে অবহেলা করেছিল, কারণ তারা বিশ্বাসই করতে পারছিল না যে এমন বিপর্যয় তাদের জীবনেও ঘটতে পারে।

কামুর মতে, মহামারি আমাদের উপলব্ধি করায় যে বাস্তবতাকে 'অস্বীকার করা' মানুষের একটি স্বভাবজাত মনস্তাত্ত্বিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। মৃত্যু যখন আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তখনও আমরা তা মেনে নিতে চাই না। মানুষ সবসময় মৃত্যুর এক অবচেতন ভয়ে বেঁচে থাকে। মহামারি থাকুক আর নাই থাকুক, মৃত্যু নিশ্চিত–এটি আসলে একটি

অনিবার্য এবং 'লুকানো বাস্তব সত্য'।

কামু আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, জীবনের এই ভঙ্গুরতাকে অকপটে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মানুষের আসল স্বাধীনতা লুকিয়ে আছে। এই উপলব্ধি আমাদের ভয় ও অসহায়ত্ব থেকে বের করে জীবন ও প্রকৃতির প্রতি আনন্দ এবং কৃতজ্ঞতার বোধে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

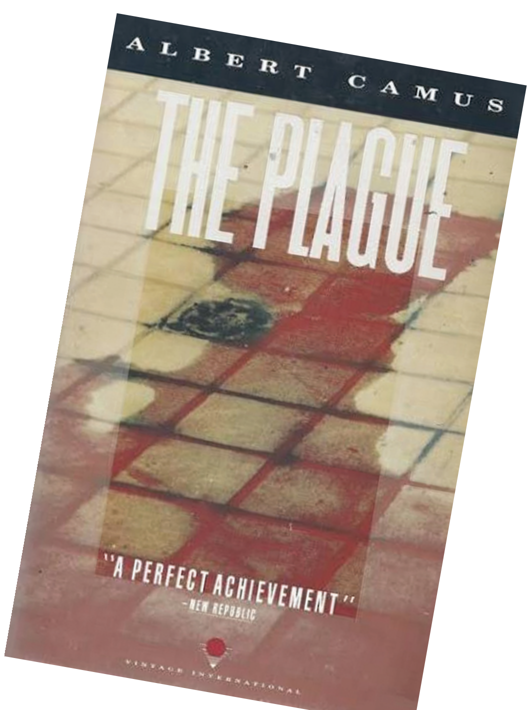

তিনি মানুষের ব্যক্তিগত সুখের আকাঙ্ক্ষা এবং সমাজ ও সহমানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্বের মধ্যকার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তুলেছেন। 'দ্য প্লেগ' উপন্যাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা হলো–মহামারি আমাদের জীবনযাত্রাকে ওলটপালট করে দিলেও, এটি আমাদের বর্তমান মুহূর্তে বাঁচতে শেখায় এবং মনে করিয়ে দেয় যে এই দুঃখ ও লড়াইটা সবার সমষ্টিগত, যার জন্য দরকার যৌথ মানবিক প্রচেষ্টা।

ভবিষ্যতের পথরেখা

সবশেষে, ইতিহাস আমাদের মহামারির কারণ এবং এর সম্ভাব্য সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিণতি সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। এর অর্থ হলো, যেকোনো বৈশ্বিক সংকটের বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় আমাদের কেবল নিজেদের সুরক্ষার কথা ভাবলেই চলবে না, বরং আমাদের কাজ অন্যদের কীভাবে প্রভাবিত করবে তাও বিবেচনা করতে হবে। কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলো আমাদের অনেকের ভেতরের লুকিয়ে থাকা সুপ্ত প্রতিভাগুলোকে ঝালিয়ে নেওয়ার একটি নতুন পথও তৈরি করে দিয়েছে।

তাই, যে সৃজনশীল কাজটি আপনাকে টানে–তা সুঁই-সুতা, রঙ-তুলি, লেখালেখি কিংবা ক্যামেরার কাজই হোক–সেটি বেছে নিন। এমন আইডিয়া বা সমাধান তৈরি করুন যা আপনাকে মানসিক আনন্দ দেয়; তবে নিজের ওপর কোনো অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করবেন না। এই গভীর আত্মোপলব্ধিই আমাদের কঠিন দিনগুলোর সাথে মানিয়ে নিতে সাহায্য করবে এবং সংকটকে রূপান্তরিত করবে সৃজনশীলতার এক নতুন বসন্তে। ■

নেতৃত্ব
সামাজিক পরিবর্তনের মূলমন্ত্র

মো: মশিউর রহমান
প্রাবন্ধিক, গবেষক ও ব্যাংকার
mashiur.du@gmail.com

নেতৃত্ব কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন কিংবা ব্যর্থতার গ্লানি এড়ানোর কোনো সংকীর্ণ কৌশল নয়; বরং তা হলো সামষ্টিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের এক সাহসী প্রয়াস। একজন প্রকৃত নেতার সত্তায় মিশে থাকে সুনির্দিষ্ট দূরদৃষ্টি (Vision), বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা, গভীর সহমর্মিতা এবং প্রখর সামাজিক দায়বদ্ধতা। ব্যক্তি, জাতি কিংবা বৈশ্বিক সম্প্রদায়কে অনুপ্রাণিত ও আলোড়িত করার এক অনন্য মনস্তাত্ত্বিক ও চারিত্রিক সক্ষমতা থাকে তাঁদের। তাঁরা কোনো চাপিয়ে দেওয়া কর্তৃত্বের জোরে নয়, বরং নিজস্ব নৈতিক গুণাবলি, চারিত্রিক দৃঢ়তা এবং কর্মের অনবদ্য দৃষ্টান্তের মাধ্যমেই অনুসারীদের হৃদয়ে আস্থার আসন স্থায়ী করেন।

প্রকৃত নেতৃত্ব কখনো অন্ধ অনুকরণে বিশ্বাসী নয়। যেমন–কাজী নজরুল ইসলাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যিক ছায়াতলে আচ্ছন্ন না হয়ে নিজস্ব দ্রোহের বাণী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন; কিংবা মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র আব্রাহাম লিংকনের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর সামাজিক ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে আমেরিকার কৃষ্ণাঙ্গ সমাজকে অধিকার সচেতন করেছিলেন। ঠিক তেমনি, ইতিহাসের প্রতিটি মহান নেতাই সমাজ-রূপান্তরের ক্ষেত্রে নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি ও অনন্য কার্যপদ্ধতির স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

তদুপরি, মহান নেতৃত্বকে কেবল বৈষয়িক বা বস্তুগত সম্পদের মাপকাঠিতে সংজ্ঞায়িত করা যায় না। হাজী মুহাম্মদ মহসিনের মতো মনীষীরা মানবকল্যাণে নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় চিরস্মরণীয় নেতা

হয়েছেন–যে গৌরব ও আত্মিক মর্যাদা পৃথিবীর বহু ধনকুবের অঢেল অর্থ দিয়েও অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। মানবসমাজ কেবল সেইসব নেতাকেই হৃদয়ে স্থান দেয় এবং পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করে, যাঁরা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সংগ্রামকে নিজের ভেতর অনুধাবন করেন, তাঁদের মনস্তত্ত্ব বোঝেন এবং মানুষের সামগ্রিক মুক্তির জন্য জীবন উৎসর্গ করেন।

দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব ও সামাজিক রূপান্তর

সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অগ্রগতির প্রধানতম শর্ত হলো নেতৃত্বের সুদূরপ্রসারী ও সুস্পষ্ট দূরদৃষ্টি। ১৯৬৫ সালে যখন সিঙ্গাপুর স্বাধীনতা লাভ করে, তখন দেশটি ছিল এক প্রকার সম্পদহীন ও সমস্যাজর্জর। কিন্তু দেশটির প্রথম প্রধানমন্ত্রী লি কুয়ান ইউ তাঁর প্রখর দূরদর্শিতা, টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং বৈপ্লবিক নগর পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করে একটি আধুনিক জাতীয় উন্নয়ন কৌশল প্রণয়ন করেন। নাগরিকদের অবিচল আত্মত্যাগ ও নেতার যোগ্য নির্দেশনায় সিঙ্গাপুর অতি দ্রুত একটি অনুন্নত ভূখণ্ড থেকে বিশ্বের অন্যতম শীর্ষ ধনী ও সভ্য রাষ্ট্রে রূপান্তরিত হয়। এই অভাবনীয় রূপান্তর কেবল একটি ভৌগোলিক পরিবর্তন নয়, বরং এটি লি কুয়ান ইউ-এর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং জাতীয় পুনর্গঠনের প্রতি তাঁর আপসহীন অঙ্গীকারেরই এক উজ্জ্বল ঐতিহাসিক দলিল।

উদ্ভাবনী চিন্তা ও আধুনিক প্রযুক্তি

কার্যকর নেতৃত্বের অন্যতম প্রধান ভিত্তি হলো অভিনব ধারণার সৃজন ও তার সফল প্রয়োগ। এই উদ্ভাবনী চিন্তাভাবনাই স্থবির সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোকে আমূল বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নিবিড় গবেষণা, সৃজনশীল মনন এবং ক্রমাগত উৎকর্ষ সাধনের তাগিদই এই উদ্ভাবনের মূল চালিকাশক্তি। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে গুগল, অ্যাপল, মেটা, লিংকডইন কিংবা মাইক্রোসফটের মতো বৈশ্বিক প্রতিষ্ঠানগুলো যে বিশ্বকে শাসন করছে, তার মূলে রয়েছে গবেষণা, উন্নয়ন ও মানবসম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের প্রতি তাদের নেতৃত্বের দূরদর্শিতা।

উদ্ভাবনের এই বৈপ্লবিক প্রভাব কেবল প্রযুক্তি খাতের চারদেয়ালে সীমাবদ্ধ নয়; তা আজ ছড়িয়ে পড়েছে জীবনযাত্রার প্রতিটি স্তরে। উদাহরণস্বরূপ, আধুনিক কৃষি খাতে 'হাইড্রোপনিক' বা মাটিবিহীন চাষাবাদের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ সীমিত জমি থেকেও বিপুল ফলন নিশ্চিত করেছে, যা খাদ্য নিরাপত্তায় এক নতুন দিগন্ত। একইভাবে, আধুনিক প্রকৌশল ও নির্মাণশৈলীর অভিনব পদ্ধতির কারণে মরুভূমির বুকেও আজ সুরম্য ও আধুনিক অবকাঠামো গড়ে উঠছে–বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে। এসব উদাহরণ প্রমাণ করে যে, প্রকৃত নেতারা হলেন নতুন সম্ভাবনার পথপ্রদর্শক, যাঁরা বিমূর্ত ধারণাকে অর্থপূর্ণ প্রগতিতে রূপান্তর করেন।

কর্মপরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন যোগ্যতা

সব উদ্ভাবনী ধারণাই তাত্ত্বিকভাবে চমৎকার মনে হতে পারে, কিন্তু তার সব কটি বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার বাস্তবে রূপান্তরযোগ্য সব ধারণাই প্রথাগতভাবে শুরুতে আর্থিকভাবে লাভজনক নাও হতে পারে। তরুণ গবেষক বা শিক্ষার্থীরা প্রায়শই অনেক সৃজনশীল ও সম্ভাবনাময় ধারণার অবতারণা করেন, কিন্তু সেগুলোর নেপথ্যে কোনো বাস্তবসম্মত ও নিয়মতান্ত্রিক বাস্তবায়ন কৌশল থাকে না। সফল নেতারা বোঝেন যে, শুধু একটি ভালো ধারণাই যথেষ্ট নয়; এর পেছনে একটি সুপরিকল্পিত এবং মাঠপর্যায়ে প্রয়োগযোগ্য সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা থাকা অপরিহার্য।

মার্ক জাকারবার্গের মতো আধুনিক উদ্যোক্তারা এই দর্শনেরই এক মূর্ত প্রতীক। তিনি কেবল একটি সামাজিক যোগাযোগের ধারণাই তৈরি করেননি, বরং নিখুঁত পরিকল্পনা ও সময়ের চাহিদাকে ধারণ করে একে বিশ্বব্যাপী একটি টেকসই ও লাভজনক মাধ্যমে রূপ দিয়েছেন। দক্ষ নেতারা সবসময় কল্পনাবিলাসিতার সাথে বাস্তবমুখী কর্মদক্ষতার এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটান, যাতে তাঁদের সৃষ্টিশীল ধারণাগুলো যেমন ভেস্তে না যায়, তেমনি তা দীর্ঘমেয়াদে স্বনির্ভর হতে পারে।

অনন্যতা বনাম অন্ধ অনুকরণ

অন্যের অন্ধ অনুকরণ করা কখনো প্রকৃত নেতৃত্বের পরিচয় হতে পারে না। সত্যিকারের নেতারা যেকোনো বৈশ্বিক বা আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন নিজস্ব স্বকীয়তা এবং সৃজনশীলতার শক্তি দিয়ে। সাহিত্যে যেমন রবীন্দ্রনাথের নান্দনিক সুকুমারতার বিপরীতে নজরুলের সাম্য ও দ্রোহের কবিতা এক সম্পূর্ণ নতুন মাত্রার জন্ম দিয়েছিল, তেমনি মার্কিন সমাজে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় মার্টিন লুথার কিং জুনিয়রের অহিংস আন্দোলন ছিল আব্রাহাম লিংকনের গৃহযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বকীয়।

এমনকি আধুনিক প্রযুক্তি খাতের দিকে তাকালেও দেখা যায়, ফেসবুক মেসেঞ্জার এবং হোয়াটসঅ্যাপ একই ধরনের বার্তা আদান-প্রদানের কাজ করলেও ব্যবহারকারীকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বকীয় উপযোগিতা প্রদান করে। অর্থাৎ, প্রতিটি মহান সৃষ্টি বা নেতৃত্বই নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে হাজির হয়। তদুপরি, প্রকৃত নেতারা সততা এবং নীতিপরায়ণতা ধরে রাখেন, এমনকি এর জন্য যদি প্রচলিত কুসংস্কার ও ঘুণে ধরা সমাজ-সংস্কারের বিরুদ্ধেও দাঁড়াতে হয়। মানবজাতির সর্বশ্রেষ্ঠ পথপ্রদর্শক হযরত মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তৎকালীন আইয়ামে জাহেলিয়াত বা অন্ধকার সমাজের প্রচলিত ও অমানবিক রীতিনীতিগুলো অন্ধভাবে মেনে নেননি; বরং তিনি মানুষকে একনিষ্ঠ সত্য ও শুদ্ধ একত্ববাদের দিকে আহ্বান করেছিলেন। সত্য, নীতি এবং নৈতিক সাহসের প্রতি এই আপসহীন অঙ্গীকারই হলো প্রকৃত নেতৃত্বের মূল ভিত্তি।

সাহসিকতা এবং প্রতিকূলতা মোকাবিলা

নেতৃত্বের অন্যতম অলংকার হলো সুচিন্তিত ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা এবং চরম প্রতিকূলতার মুখেও নিজের আদর্শে অবিচল থাকার সাহসিকতা। নেলসন ম্যান্ডেলা তাঁর বর্ণবাদবিরোধী দীর্ঘ সংগ্রামের জন্য জীবনের মূল্যবান ২৭টি বছর কারান্তরালে কাটিয়ে আপসহীন সাহসের

এক অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। একইভাবে, হযরত মুহাম্মদ (সা.) তাঁর আদর্শ প্রচারের জন্য মাতৃভূমি ত্যাগ করেছিলেন এবং চরমতম প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তবুও তিনি কখনো ব্যক্তিগত লাভ বা সাময়িক সুবিধার জন্য নিজের ঐশী নীতির সাথে সামান্যতম আপস করেননি।

দূরদৃষ্টিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য এই আত্মিক সাহস অপরিহার্য। তাই, ভবিষ্যৎ নেতৃত্বকে অবশ্যই বাধা-বিপত্তির মুখোমুখি হওয়ার এবং লক্ষ্য অর্জনে অবিচল থাকার মানসিক শক্তি অর্জন করতে হবে। এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী এ দেশের মেহনতি মানুষের কল্যাণে এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় আজীবন অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে গেছেন। সাধারণ মানুষের অধিকারের প্রতি তাঁর এই আপসহীন অঙ্গীকারই তাঁকে ইতিহাসের পাতায় চিরস্থায়ী শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

সততা ও বিশ্বাসযোগ্যতা

সততা হলো কার্যকর নেতৃত্বের প্রাণভোমরা। সততা ও স্বচ্ছতা ছাড়া কোনো নেতাই তাঁর অনুসারীদের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্বাস অর্জন করতে পারেন না, আর সফল নেতৃত্বের জন্য এই পারস্পরিক বিশ্বাসের বন্ধন থাকা অপরিহার্য। যেসব প্রাতিষ্ঠানিক বা সামাজিক সংগঠন নিয়মিত তাদের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তারা খুব সহজেই তাদের অংশীজনদের (Stakeholders) আস্থা ও আনুগত্য লাভ করে।

ইতিহাসের সম্মানিত ও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতারা সবসময় তাঁদের সত্যবাদিতা, নীতিপরায়ণতা এবং নিষ্কলঙ্ক নৈতিক চরিত্রের জন্যই স্মরণীয় হয়ে আছেন। যেমন, মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ সত্য এবং অহিংস নৈতিক আচরণের প্রতি তাঁর অবিচল নিষ্ঠার জন্য সর্বজনশ্রদ্ধেয়। তাই, প্রত্যেক নেতারই ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সততার নিবিড় চর্চা করা উচিত; কারণ এটি মনে রাখা প্রয়োজন যে, দীর্ঘ সময় ধরে কথন ও করণের (কথার ও কাজের) মিল রাখার মাধ্যমেই মানুষের সাথে বিশ্বাসের মজবুত সেতু গড়ে ওঠে।

সহমর্মিতা ও সামাজিক দায়বদ্ধতা

নেতারা অনুভূতিহীন কোনো যান্ত্রিক সত্তা নন; তাঁদের অন্তরে থাকে গভীর সহমর্মিতা এবং মানবজাতির প্রতি নিঃশর্ত ভালোবাসা। তাঁরা মানুষের ব্যক্তিগত ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধা করেন এবং সবাইকে জোরপূর্বক একইভাবে চিন্তা বা কাজ করতে বাধ্য না করে, বরং প্রত্যেকের ব্যক্তিগত যোগ্যতা ও সুপ্ত সম্ভাবনার ওপর ভিত্তি করে তাঁদের মূল্যায়ন করেন। একজন প্রকৃত নেতা সবসময় সামষ্টিক সুখ ও কল্যাণ কামনা করেন। ইতিহাসজুড়ে নবী-রাসূল, দার্শনিক এবং মহান সমাজসংস্কারকেরা সমাজের মঙ্গলের জন্য নিজেদের জীবন, সময় ও সম্পদ বিলিয়ে দিয়ে এই সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রমাণ রেখে গেছেন।

বর্তমান একবিংশ শতাব্দীতে নেতৃত্ব দিতে গেলে সমাজ আর পরিবেশের প্রতি দায়বদ্ধ হওয়াটাও সমান জরুরি। এই দীর্ঘমেয়াদী টেকসই ভাবনা থেকেই আজ বিশ্বমঞ্চে করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা (CSR), টেকসই উন্নয়ন (Sustainable Development) আর জলবায়ু সুরক্ষার মতো বিষয়গুলো অবধারিত হয়ে উঠেছে। সমাজ বা পরিবেশের ক্ষতি করে কোনোদিনই প্রকৃত বা স্থায়ী সাফল্য পাওয়া যায় না, কারণ মানুষের অস্তিত্ব এই ধরিত্রীর ভালো থাকার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। তাই, আধুনিক সমাজ

ও করপোরেট বিশ্বকে এমন নেতৃত্ব দিতে হবে যা প্রকৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং সবার জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

সহানুভূতি বনাম সহমর্মিতা: মনস্তাত্ত্বিক তফাত

অন্যদের প্রতি প্রকৃত দরদ প্রদর্শন না করে কেউ কখনোই দীর্ঘস্থায়ী মানসিক প্রশান্তি অর্জন করতে পারেন না কিংবা একজন সফল নেতা হতে পারেন না। এই ধারণাটি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে-সাফল্য ও সুখকে কেবল বৈষয়িক সম্পদ বা জাগতিক জিনিসপত্র দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। সমাজবিদ্যা, শিল্পকলা এবং বাস্তব জীবনের নানা ঘটনায় দেখা যায়, কীভাবে মানুষের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসা সমাজ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত প্রশংসা ও সমর্থন এনে দেয়।

এখানে 'Sympathy' (সহানুভূতি) এবং 'Empathy' (সহমর্মিতা)-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক পার্থক্যটি বোঝা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহানুভূতি হলো কারও কষ্টের জন্য কেবল বাইরে থেকে দুঃখ প্রকাশ বা মৌখিক সান্ত্বনা দেওয়া। আর সহমর্মিতা বা এম্প্যাথি হলো আরও এক ধাপ এগিয়ে অন্যের কষ্টটাকে নিজের মন দিয়ে অনুধাবন করা, তার জুতোয় পা গলিয়ে পরিস্থিতিকে দেখা এবং তাকে সাহায্য করার জন্য অর্থপূর্ণ পদক্ষেপ নেওয়া।

উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে, তখন কিছু মানুষ কেবল তাদের স্মার্টফোনে সেই নির্মম ঘটনার ভিডিও ধারণ করতে ব্যস্ত থাকে (যা চূড়ান্ত সহানুভূতির অভাব ও যান্ত্রিকতা), আর কিছু মানুষ তাৎক্ষণিকভাবে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে সহায়তা করে। যারা কাজের মাধ্যমে এই প্রকৃত সহমর্মিতা দেখায়, সমাজ তাদেরই হৃদয়ে স্থান দেয়। চূড়ান্ত বিচারে, মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এমন নেতৃত্বের প্রতি আকৃষ্ট হয়, যারা কেবল গালভরা কথা বলে না, বরং সংকটে প্রকৃত সহমর্মিতা ও আন্তরিকতা দেখায়।

অনুসারী ও নেতার পারস্পরিক মনস্তত্ত্ব

নেতার অগ্রগতি এবং সাফল্যের নেপথ্যে অনুসারী বা কর্মীবাহিনী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে। একজন নেতা যখন মানুষের সাথে অর্থপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলেন এবং তাঁদের স্বপ্ন ও আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নিজের করে নেন, তখন তাঁর প্রভাব জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পায়।

বর্তমান যুগে ফেসবুক বা অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো সারা বিশ্বের মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে সংযোগের এক দারুণ ক্ষমতা দেখিয়েছে, যা আধুনিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিন্তু এই ভার্চুয়াল সংযোগের চেয়েও শক্তিশালী হলো একজন নেতার বাস্তবমুখী 'কমিউনিটি' বা গোষ্ঠী গড়ে তোলার ক্ষমতা। সফল নেতা হলেন তিনিই, যিনি একটি সাধারণ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে বৈচিত্র্যময় মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে পারেন।

উদাহরণস্বরূপ, মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়ার সমাজের একটি বহুমাত্রিক ও জাতিগতভাবে বৈচিত্র্যময় অংশকে কার্যকরভাবে ঐক্যবদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যা দেশটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে যুগান্তকারী অবদান রেখেছিল। তাঁর নেতৃত্ব এই বিষয়ের একটি অনন্য উদাহরণ যে, নেতা এবং অনুসারীদের মধ্যকার শক্তিশালী মনস্তাত্ত্বিক সম্পর্ক কীভাবে একটি দেশের সামগ্রিক অগ্রগতিকে ত্বরান্বিত করতে পারে। আধুনিক বিপণনবিদ্যার (Marketing) মতোই নেতৃত্বও মূলত সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সাধারণ মূল্যবোধের ভিত্তিতে মানুষকে এক সুতোয় বেঁধে রাখার একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক মাধ্যম।

কথামালা বনাম কার্যকর পদক্ষেপ

দক্ষ নেতারা স্পষ্ট ও অর্থপূর্ণ যোগাযোগের পাশাপাশি কাজকে সমানভাবে অগ্রাধিকার দেন। কেবল চটকদার মুখের কথা দিয়ে মহান নেতৃত্ব গড়ে তোলা যায় না; নেতার বাচনভঙ্গিকে তাঁর কর্ম দিয়েই প্রমাণিত হতে হয়। ইতিহাসজুড়ে সমাজসংস্কারক ও যুগান্তকারী নেতারা কেবল মূল্যবান নীতিমালার কথাই প্রচার করেননি, বরং নিজেদের আচরণ ও কাজের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন। নিজেরা আদর্শ উদাহরণ (Role Model) হয়ে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে তাঁদের বার্তা অনুসারীদের কাছে আরও বেশি বিশ্বাসযোগ্য, সহজবোধ্য এবং অনুপ্রেরণাদায়ক হয়ে উঠেছিল।

মানুষ স্বাভাবিকভাবেই এমন নেতাদের প্রতি আকৃষ্ট হয় যাঁদের কথার সাথে কাজের নিখুঁত মিল থাকে। তাই, মহান নেতারা কেবল সুন্দর পরিকল্পনাই তৈরি করেন না-তাঁরা সেগুলো মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন করেন এবং দৃশ্যমান ফলাফল এনে দেখান। মূলত নিয়মিত প্রচেষ্টা, উৎসর্গ এবং পরিমাপযোগ্য সাফল্যের মাধ্যমেই নেতারা অন্যের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। চূড়ান্ত বিচারে, আসল নেতৃত্ব কেবল প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরিতে প্রকাশ পায় না, বরং অর্থপূর্ণ কাজ এবং ইতিবাচক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমেই প্রমাণিত হয়।

উপসংহার

সম্পদ বিলিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রকৃত সুখ ও আত্মতৃপ্তি অর্জন করতে হলে, আগে সেই সম্পদ সৎ, ন্যায্য ও সৃজনশীল উপায়ে অর্জন করতে হবে। তাই, আপনার উদ্ভাবনী চিন্তাকে অগ্রাধিকার দিন, একটি পূর্ণাঙ্গ ও বাস্তবমুখী কর্মপরিকল্পনা তৈরি করুন এবং মানুষের কল্যাণের মহৎ লক্ষ্য নিয়ে তা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নের জন্য সবার সাথে শক্তিশালী সামাজিক যোগাযোগ ও সম্পর্ক গড়ে তুলুন। এই প্রয়াস কেবল অন্যদের জীবনেই সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে না, বরং আপনার নিজের মনেও এক অনাবিল স্বর্গীয় আনন্দ বয়ে আনবে; কারণ সম্পদ নিজে একাকী ভোগ করার চেয়ে তা সামষ্টিক কল্যাণে বিলিয়ে দেওয়ার আনন্দ অনেক বেশি। তাই হাত পেতে নেওয়ার চেয়ে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার (দাতা হওয়ার) উদার মানসিকতা ধারণ করুন, এবং অন্যের জীবনকে সমৃদ্ধ করার মাঝেই নিজের নশ্বর জীবনের প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে নিন।

কেননা, দিনশেষে নিঃস্বার্থ, কর্মমুখী ও নীতিবদ্ধ নেতৃত্বই হলো সামাজিক পরিবর্তনের আসল মূলমন্ত্র। ■

পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়:

মহাকাশবিজ্ঞানের আলোকে ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিদর্শনের অনুসন্ধান

আহমাদ ওয়াহাজ সিদ্দিকী

ইসলামী ঐতিহ্যে এমন এক অনাগত সময়ের কথা বলা হয়েছে যখন সূর্য চিরন্তন নিয়মের বাইরে গিয়ে পশ্চিম দিক থেকে উদিত হবে, যা কিয়ামতের (মহাপ্রলয়) অন্যতম প্রধান এক মহানিদর্শন। ঘটনাটি মূলত সম্পূর্ণ বিশ্বাসের বিষয় হলেও, সমসাময়িক কিছু গবেষক ও লেখক খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন যে–ভবিষ্যতের কোনো সম্ভাব্য মহাজাগতিক ঘটনা বা জ্যোতির্বিজ্ঞানীয় প্রক্রিয়া এর কোনো তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে পারে কি না।

ইসলামী ঐতিহ্যে বর্ণিত কিয়ামতের মহাসংকেতগুলোর মধ্যে অন্যতম একটি অলৌকিক ও যুগান্তকারী ঘটনা হলো পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই অনন্য ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলিম মনীষী, ধর্মতত্ত্ববিদ এবং সাধারণ বিশ্বাসীদের গভীরভাবে আন্দোলিত ও ভাবিত করেছে। যদিও এই ঘটনার প্রকৃত রহস্য ও বাস্তবতা সম্পূর্ণভাবে ঐশ্বরিক জ্ঞানের অধীন, তবুও আধুনিক বিজ্ঞানমনস্ক মহলে এটি নিয়ে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা রয়েছে।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে উল্লেখ আছে যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এমন একটি সময়ের কথা অবতীর্ণ করেছিলেন যখন সূর্য তার চিরাচরিত নিয়ম ভেঙে পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে। এই অলৌকিক ঘটনার অব্যবহিত পূর্বে একটি অস্বাভাবিক দীর্ঘ রাতের বর্ণনা রয়েছে, যা মানবজাতির মধ্যে তীব্র ভয়, শঙ্কা ও অনিশ্চয়তা তৈরি করবে। বর্ণনা অনুসারে, সূর্য একবার পশ্চিম দিক থেকে উদিত হয়ে গেলে তাওবা বা আত্মসংশোধনের চিরন্তন দুয়ার বন্ধ হয়ে যাবে; এবং এরপর নতুন করে ঈমান আনয়ন এমন কোনো ব্যক্তির উপকারে আসবে না, যে পূর্বে বিশ্বাস স্থাপন করেনি।

মুসলিম উম্মাহর কাছে এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মূলত 'গায়েব' বা অদৃশ্যের প্রতি অবিচল বিশ্বাসের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। তা সত্ত্বেও, বর্তমান মহাকাশবিজ্ঞান এবং গ্রহবিজ্ঞানের (planetary science) অভূতপূর্ব অগ্রগতি কিছু গবেষককে এটি খতিয়ে দেখতে উৎসাহিত করেছে যে–পরিচিত কোনো মহাজাগতিক গতিপ্রকৃতি এই ধরনের ঘটনা ঘটার পেছনে কোনো সম্ভাব্য ইঙ্গিত দেয় কি না।

আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে এই মহাবিশ্ব স্থবির নয়, বরং চরম গতিশীল। এখানে প্রতিনিয়ত তারকারাজির জন্ম ও অবসান ঘটছে, ছায়াপথগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ হচ্ছে এবং মহাজাগতিক বস্তুসমূহ মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে অবিরত একে অপরকে প্রভাবিত করছে। স্বয়ং আমাদের পৃথিবীর কক্ষপথ, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং ঘূর্ণন বৈশিষ্ট্যের (axial rotation) মধ্যেও সময়ের সাথে সাথে সূক্ষ্ম পরিবর্তন পরিমাপ করা গেছে। যদিও এই পরিবর্তনগুলো সাধারণত দীর্ঘ ভূতাত্ত্বিক সময়জুড়ে অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘটে থাকে, তবুও এগুলো স্পষ্ট বুঝিয়ে দেয় যে যেকোনো গ্রহমণ্ডলই আসলে এক বিশাল ও শক্তিশালী মহাজাগতিক বলয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন।

একটি তাত্ত্বিক হাইপোথিসিস বা অনুমানে বলা হয়েছে, কোনো এক মহাজাগতিক বস্তু–যেমন কোনো বিশাল আকৃতির 'রোগ প্ল্যানেট' (rogue planet বা কক্ষচ্যুত ভাসমান গ্রহ), মৃত নক্ষত্র কিংবা অন্য কোনো জ্যোতিষ্ক–যদি আমাদের সৌরজগতের বিপজ্জনক সীমানায় চলে আসে, তবে তার প্রচণ্ড মহাকর্ষীয় টানের কারণে সাময়িকভাবে পৃথিবীর গতিপথ প্রভাবিত হতে পারে।

এই তাত্ত্বিক অনুমান অনুযায়ী, সেই বিশাল মহাজাগতিক বস্তুর আগমন পৃথিবীর আবর্তন গতি, চৌম্বক ক্ষেত্র এবং মহাকর্ষীয় ভারসাম্যের মধ্যকার সূক্ষ্ম বিন্যাসকে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করতে পারে। তাত্ত্বিকভাবে, এমন কোনো চরম মহাজাগতিক বিপর্যয় যদি পৃথিবীর ঘূর্ণন অক্ষ বা দিক পরিবর্তন (retrograde rotation) করে ফেলে, তবে ভূপৃষ্ঠের পর্যবেক্ষকদের দৃষ্টিতে সূর্য পূর্বের পরিবর্তে পশ্চিম দিগন্তে উদিত হবে।

এই মতবাদের প্রবক্তারা কিছু বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের দিকে ইঙ্গিত করেন। এটি প্রমাণিত যে, পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র ক্রমাগত ওঠানামা করে এবং ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে এটি বহুবার উল্টে গেছে, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় 'জিওম্যাগনেটিক রিভার্সাল' (geomagnetic reversal) বা মেরু পরিবর্তন বলা হয়। পাশাপাশি, সৌরঝড় এবং পৃথিবীর ম্যাগনেটোস্ফিয়ারের (চৌম্বক মণ্ডল) মধ্যকার মিথস্ক্রিয়া আমাদের গ্রহের তড়িৎ-চৌম্বকীয় পরিবেশকে প্রতিনিয়ত প্রভাবিত করছে।

তবে এখানে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক সতর্কতা মনে রাখা প্রয়োজন: সমসাময়িক জ্যোতির্বিজ্ঞান বা ভূ-পদার্থবিজ্ঞান এমন কোনো সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে না যে, চৌম্বক ক্ষেত্রের মেরু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি থমকে গিয়ে বিপরীত দিকে ঘুরতে শুরু করবে। এমনকি কাছাকাছি থাকা কোনো মহাজাগতিক বস্তু বর্ণিত উপায়ে পৃথিবীর আবর্তন গতিকে সম্পূর্ণ উল্টে দিতে পারে–এমন কোনো সুপ্রতিষ্ঠিত বৈজ্ঞানিক প্রমাণও আজ পর্যন্ত মেলেনি। অতএব, এই ধারণাগুলো নিছকই অনুমাননির্ভর এবং এগুলোকে সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরিবর্তে তাত্ত্বিক সম্ভাবনা হিসেবেই গণ্য করা সমীচীন।

তা সত্ত্বেও, এই আলোচনাটি একটি মৌলিক সত্যকে সামনে নিয়ে আসে: অতীতে যেসব ঘটনাকে অসম্ভব বলে মনে হতো, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে সেগুলোর পেছনে কাজ করা প্রকৃতির নিয়মগুলো আমাদের কাছে উন্মোচিত হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী, জ্যোতির্বিজ্ঞানের নিত্যনতুন আবিষ্কারগুলো বারবার প্রমাণ করেছে যে, এই মহাবিশ্ব পূর্ববর্তী প্রজন্মের ভাবনার চেয়ে অনেক বেশি জটিল, রহস্যময় এবং গতিশীল।

ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্বাসীরা মনে করেন যে, পরম সৃষ্টিকর্তার ক্ষমতা বর্তমান বিজ্ঞানের চেনা ছক বা চাক্ষুষ নিয়মের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ নয়। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের এই ঘটনা কোনো মহাজাগতিক নিয়মের চূড়ান্ত পরিণতিতে ঘটবে, নাকি মানুষের অব্যাখ্যাত কোনো বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন হবে, নাকি সম্পূর্ণ ভিন্ন কোনো অলৌকিক উপায়ে ঘটবে–তা নিশ্চিত করে বলা মানবীয় সীমাবদ্ধতার অতীত।

প্রকৃতপক্ষে, এই ভবিষ্যদ্বাণীমূলক নিদর্শনের চিরন্তন গুরুত্ব এটি ঘটার বৈজ্ঞানিক কার্যপ্রণালীর মধ্যে নিহিত নয়, বরং এর অন্তর্নিহিত নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে রয়েছে। এই ঐশী সতর্কবার্তাটি মানবজাতিকে মনে করিয়ে দেয় যে-তাওবা, আত্মশুদ্ধি এবং আধ্যাত্মিক নবায়নের সুযোগ অনন্তকাল ধরে খোলা থাকবে না। এটি মানুষকে তার স্বাধীন ইচ্ছা ও বিবেক সচল থাকা অবস্থাতেই অন্তিম সময়ের জন্য আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি নেওয়ার আহ্বান জানায়।

তাই বলা যায়, পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণীটি মানুষের অটল বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞান এবং মহাবিশ্বের অন্তহীন রহস্য উন্মোচনে মানবজাতির চিরন্তন অনুসন্ধানের মোহনায় দাঁড়িয়ে এক গভীর জীবনদর্শনের খোরাক জুগিয়ে চলেছে। ■

দ্রষ্টব্য : *নিবন্ধে আলোচিত মহাকাশবিজ্ঞান সংক্রান্ত ব্যাখ্যাগুলো মূলত সমসাময়িক গবেষকদের তাত্ত্বিক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত হয়েছে, যা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে এখনও চূড়ান্ত প্রমাণের অপেক্ষায় এবং সদা পরিবর্তনশীল পর্যালোচনার সুযোগ রাখে।*